স্বামি শিষ্য সংবাদ

(পূর্ব্ব কাণ্ড)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রণীত।

১৫ই মাঘ, ১৩১৯

মূল্য ১৲ এক টাকা

স্বামি শিষ্য সংবাদ

পূর্বকাণ্ড

(~~উত্তর কাণ্ড~~) ২



শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

 সুলভ সংস্করণ মূল্য ৸০ আনা

প্রথম সংস্করণ—১৫ই মাঘ ১৩১৯ সাল।
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৫ই চৈত্র ১৩২০ সাল।

সূচীপত্র।

উত্তর কাণ্ড—কাল, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

সপ্তদশ বল্লী—

অষ্টাদশ বল্লী—

ঊনবিংশ বল্লী—



বিজ্ঞাপন।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্ নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজির অলৌকিক দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ বহুদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার, পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; যে শক্তিমান্ পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় জগতের মনীষিগণই স্তম্ভিত হইয়া অনতিকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে, মঠে সর্ব্বদা কিরূপ উচ্চ-ভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সর্ব্বদা শিক্ষা-দীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন, এবং সর্ব্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে জীবনে মরণে কিরূপ ভাবে অনুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে। আবার স্বামীজির মতামত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত, স্বামীজির

বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতৃগণের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয় সকলের স্থান কালাদির নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার, গ্রন্থখানির আদিতে সমগ্র পুস্তকের বিস্তৃত সূচীপত্র এবং গ্রন্থমধ্যস্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায় নির্ণীত বিষয় সকলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া, গ্রন্থনিবদ্ধ প্রত্যেক বিষয় সহজে ধরিবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার যে, বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার পুস্তকখানির সমুদায় সত্ত্ব, বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষের হস্তে শ্রীবিবেকানন্দের ঐ মঠস্থ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নিজ গুরুভক্তি-নিদর্শন-স্বরূপ প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত নিবেদক

শ্রীসারদানন্দ।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বকাণ্ড।



কাল— ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

* চতুর্থ বল্লীতে ভুলক্রমে মার্চ্চ মাস ছাপা হইয়াছে।

দেখাইতেই স্বামীজির আগমন—এক শ্রেণীর বেদান্তবাদীর মত, সংসারের সকলে যতক্ষণ না মুক্ত হইবে ততক্ষণ তোমার মুক্তি অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞান লাভে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ ও সকল জীবকে নিজ সত্ত্বা বলিয়া অনুভব হয়—অজ্ঞানাবলম্বনেই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার চলিয়াছে—অজ্ঞানের আদি ও অন্ত —শাস্ত্রোক্তি, অজ্ঞান প্রবাহরূপে নিত্যপ্রায়, কিন্তু সান্ত— নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—যাহা পুর্ব্বে কখন দেখি নাই তদ্বিষয়ে অভ্যাস হয় কি না—ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ, মূকাস্বাদনবৎ। পৃষ্ঠা—



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

প্রথম বল্লী।

প্রথম দর্শন।



স্থান—কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজির সহিত শিষ্যের প্রথম পরিচয় মিরর্ সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আলাপন—ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় আলোচনা—ভারতবাসীকর্ত্তৃক পাশ্চাত্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভবিষ্যৎ ফল—ধর্ম্ম ও রাজনীতি চর্চ্চার মধ্যে কোন্‌টীর দ্বারা ভারতের ভাবী কল্যাণ—গোরক্ষা প্রচারকের সহিত আলাপ—মানুষ রক্ষা অগ্রে কর্ত্তব্য।

তিন চারি দিন হইল, স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের এখন আর

আনন্দের অবধি নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্গতিপন্নেরা আবার, এখন নিজ নিজ বাটীতে স্বামীজিকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামীজির নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুযো মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজির সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামিজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজির নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজি মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটী শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবরিষ্ঠ নাগ মহাশয়ের কাছে তাহারই যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজি জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামিজীকে করপুটে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজি তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম, ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। কথাগুলি নাগ মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের

ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বিবেক- চূড়ামণির এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥"

"হে বিদ্বন্! ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগরপারের উপায় আছে। যাহা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগি-গণ এই সংসারসাগর পার হইয়াছেন, সেই উৎকৃষ্ট পথ—আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিব।"—এবং তাহাকে আচার্য্য শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

শিষ্য কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতে লাগিল স্বামীজি তাহাকে ঐরূপে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের জন্য সঙ্কেত করিতেছেন কি? শিষ্য তখন অতীব আচারী ও বেদান্তমতবাদী। গুরুকরণাদিতে এখনও তাহার মতি স্থির হয় নাই এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সে একান্ত পক্ষপাতী।

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, মিরর্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজি সংবাদবাহককে বলিলেন—"তাঁহাকে এখানে নিয়ে এসো।" নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজিকে নানা প্রশ্ন করিতে

লাগিলেন। প্রশ্নোত্তরে স্বামীজি বলিলেন—আমেরিকাবাসীর মত এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসৎকারপরায়ণ, নব নব ভাব গ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। বলিলেন —"আমেরিকায় যাহা কিছু কার্য্য হইয়াছে তাহা আমার শক্তিতে হয় নাই; আমেরিকা দেশের লোক এত সহৃদয় বলিয়াই তাঁহারা বেদান্তভাব গ্রহণ করিয়াছেন।" ইংলণ্ডের কথা উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, ইংরেজের মত Conservative (প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাহাদিগকে একবার কোন ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা কিছুতেই তাহা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অন্য কোন জাতিতে মিলে না। সেইজন্যই তাহারা সভ্যতা ও শক্তিসঞ্চয়ে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনন্তর উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্তকার্য্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা জানাইয়া বলিলেন— "আমি কেবল কার্য্যের পত্তন মাত্র করিয়া আসিয়াছি। পরবর্ত্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করিলে, কালে অনেক কার্য্য হইবে।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?"

স্বামীজি বলিলেন—"আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্ত-ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নাই বল্লেই হয়। কিন্তু এই সার্ব্বভৌমিক বেদান্তবাদ, যাহাতে সকল

মতের, সকল পথের লোককেই, ধর্ম্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে, ইহার প্রচারে—পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানিতে পারিবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল এবং এখনও রহিয়াছে। এই মতের চর্চ্চায় পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইবে—অনেকটা এখনিই হইয়াছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে আমরা তাহাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া, জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হইব। পক্ষান্তরে তাহারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করিয়া পারমার্থিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে।”

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই আদান প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি না?” স্বামীজি বলিলেন—“ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া কার্য্য করিতেছে। আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব—তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন। হিমালয়ের সাম্‌নে সামান্য উপলখণ্ড যেরূপ, উহাদের ও আমাদের ঐ শক্তি-প্রয়োগকুশলতায় তদ্রূপ প্রভেদ। আমার মত কি জানেন?—আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিয়া, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকিব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য

বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে। ধর্ম্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম্ম শিখ্‌তে বস্‌বে সেই দিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিন রাত চীৎকার করে ওদের এ দেও ও দেও বল্‌লে কিছু হবে না। এই আদান-প্রদান-রূপ কার্য্য দ্বারা যখন উভয় পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে তখন আর চেঁচামেচি কর্‌তে হবে না। ওরা আপনা হ'তেই সব কর্‌বে। আমার বিশ্বাস এইরূপে ধর্ম্মের চর্চ্চায় ও বেদান্ত ধর্ম্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতি চর্চ্চা এর তুলনায় গৌণ (Secondary) উপায় বলিয়া আমার নিকট বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে জীবন ক্ষয় কর্‌বো। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্য ভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন ত, অন্য ভাবে কার্য্য করে যাউন।”

নরেন্দ্র বাবু, স্বামীজির কথায় অবিসংবাদী সম্মতি প্রকাশ করিয়া, কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য, স্বামীজির পূর্ব্বোক্ত কথা সকল শুনিয়া অবাক্ হইয়া, তাঁহার দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরো না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত—মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ী বাঁধা—দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা প্রচারকের আগমনবার্ত্তা পাইয়া স্বামীজি বাহিরের ঘরে

আসিলেন। প্রচারক স্বামীজিকে অভিবাদন করিয়া, গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজি, উহা হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া, তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন—

স্বামীজি। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে—যেখানে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য এবং কসায়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হয়।

স্বামীজি। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

স্বামীজি। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক। মাড়োয়ারী বণিক্‌সম্প্রদায় এ কার্য্যের বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহারা এই সৎকার্য্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজি। মধ্য ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষ কালে কোন সাহায্য দানের আয়োজন করিয়াছে কি?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবল মাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজি। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যু-

মুখে পতিত হইল, বহু গচ্ছিত অর্থ সত্বেও আপনারা, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে অন্ন দিয়া সাহায্য করা উচিত মনে করেন নাই?

প্রচারক। না; লোকের কর্ম্মফলে—পাপে—এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজির সেই বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল; মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন—"যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরিতেছে দেখিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশিরাশি অন্ন বিতরণ করে, তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই—তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মফলে মানুষ মর্‌ছে—এরূপে কর্ম্মের দোহাই দিলে, জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন আপন কর্ম্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মচ্চেন—আমাদের উহাতে কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।"

প্রচারক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"হাঁ, আপনি যা বল্‌ছেন, তা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—'গরু আমাদের মাতা'।"

স্বামীজি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"হাঁ, গরু যে আমাদের মা,

তা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি—তা না হইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব কর্‌বেন ?”

হিন্দুস্থানী প্রচারক, ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামীজির বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না), স্বামীজিকে বলিলেন যে, এই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজি। আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো যাতে আপনাদের সাহায্য কোর্‌বো ? তবে আমার হাতে যদি কখনো অর্থ হয়, তবে অগ্রে মানুষের সেবায় ব্যয় কর্‌বো। মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান করতে হবে। এসব করে যদি অর্থবাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।” কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজিকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজি আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “কি কথাই বল্‌লে। বলে কি না কর্ম্মফলে মানুষ মর্‌ছে তাদের দয়া করে কি হবে ? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে ইহাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌লি। মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ ?” এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে, দুঃখে শিহরিয়া উঠিল।

অনন্তর—স্বামীজি তামাক টানিতে টানিতে শিষ্যকে বলিলেন, —“আবার আমার সঙ্গে দেখা করিও।”

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

শিষ্য। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়ত কোন বড় মানুষের বাড়ীতে থাকিবেন, আমাকে তথায় যাইতে দিবে ত?

স্বামীজি। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাজার মঠে ও, কখন কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগান বাড়ীতে থাকৃব। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

স্বামীজি। তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব—বেদান্তের কথা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি; তাহারা আমার বেশভূষা ও কথা-বার্ত্তায় রুষ্ট হইবে না ত?

স্বামীজি। তারাও সব মানুষ। বিশেষত বেদান্তধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুসী হবে।

শিষ্য। মহাশয়, বেদান্তে যে সব অধিকারীর লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যদের ভিতর কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে বলে—"অধীত বেদবেদান্ত, কৃত প্রায়শ্চিত্ত, নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আহারবিহারে পরম সংযত বিশেষতঃ চতুঃসাধন সম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় না।" আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ তাহাতে অশন বসনে অনাচারী; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া?

স্বামীজি। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝ্‌তে পার্‌বে তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

স্বামীজি বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে শিষ্য একজন নিষ্ঠাবান্, আচারী হিন্দু। অনন্তর স্বামীজি কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া, দর্জি পাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বিতীয় বল্লী।

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও ৺গোপাললাল শীলের বাগানে।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—চেতনের লক্ষণ, জীবন-সংগ্রাম পটুতা—মনুষ্য জাতির জীবনীশক্তি পরীক্ষায়ও ঐ এক নিয়ম—ভারতের জড়ত্বের কারণ, আপনাকে শক্তিহীন মনে করা,—প্রত্যেকের ভিতরেই অনন্ত শক্তির উৎসস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান—উহা দেখাইতে বুঝাইতেই মহাপুরুষদিগের আগমন—ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয়—তীব্র ব্যাকুলতাই ধর্ম্মলাভের উপায়—বর্ত্তমান যুগে গীতোক্ত কর্ম্মের আবশ্যকতা—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজা চাই—রজোগুণের উদ্দীপনা দেশে প্রয়োজন।

স্বামীজি অদ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ* মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল স্বামীজি তখন গোপাল লাল শীলের বাগান বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন "চল্ আমার সঙ্গে" শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গা দর্শন হইবামাত্র স্বামীজি আপন মনে সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, "গঙ্গা-

* বাঙ্গালার সুবিখ্যাত নট ও নাটকাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তাগ্রণী ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং ইত্যাদি"। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বর-লহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল! কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর হাইড্রলিক্ ব্রিজের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন "দেখ্ দেখি কেমন সিঙ্গির মত যাচ্ছে।" শিষ্য বলিল "উহা ত জড়। উহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে তবেত উহা চলিতেছে ? ঐরূপে চলায় নিজের বাহাদুরি কি আর আছে।"

স্বামীজি। বল্ দেখি চেতনের লক্ষণ কি ?

শিষ্য। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন।

স্বামীজি। যাহাই nature এর againstএ rebellion করে (প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে) তাহাই চেতন, তাহাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্না একটা সামান্য পিঁপড়েকে মার্‌তে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) কর্‌বে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার) যেখানে rebellion (সংগ্রাম) সেইখানেই জীবনের চিহ্ন, সেই-খানেই চৈতন্যের বিকাশ।

শিষ্য। মানুষের ও মনুষ্যজাতি সমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে মহাশয় ?

স্বামীজি। খাটে, কি, না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্না। দেখ্‌বি, তোরা ছাড়া আর সকল জাতির সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে, আজকাল জড়বৎ

পড়ে আছিস্। তোদের hypnotise (মন্ত্রমুগ্ধ) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে তোদের অপরে বলেছে তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নাই—তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হোতে চোল্‌লো ভাব্‌ছিস্‌ আমরা হীন, সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই-ই হয়ে পড়েছিস্। (আপনার শরীর দেখাইয়া) এ দেহও ত তোদের দেশের মাটি থেকে জন্মেছে?—আমি কিন্তু কখন ওরূপ ভাবি নাই। তাই দেখ্‌না, তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মত খাতির করেছে ও কর্‌ছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাব্‌তে পারিস্‌ যে, আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে এবং অন্তরের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস্ ত তোরাও আমার মত হতে পারিস্‌।

শিষ্য। ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতে ঐ কথা শুনায় ও বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল, কেবল চাকরী লাভের জন্য, এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজি। তাই ত আমরা এসেছি অন্যরূপ শিখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ্‌, বোঝ্‌, অনুভূতি কর্—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে

পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্, 'উঠ—জাগ—আর ঘুমিও না" ; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোদের নিজের ভিতরেই রয়েছে ; একথা বিশ্বাস কর্, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠ্‌বে।' ঐকথা সকলকে বল্ ও সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাসের (মূল কথাগুলি) mass এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার কোর্‌বো—প্রথম, তাদের শিখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ কর্‌বো, মতলব কর্‌ছি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা ত অনেক অর্থসাপেক্ষ, টাকা কোথায় পাইবেন ?

স্বামীজি। তুই কি বল্‌ছিস্? মানুষেই ত টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথায় শুনেছিস্? তুই যদি মন মুখ এক কর্‌তে পারিস্, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস্ ত জলের মত টাকা আপনা আপনি তোর পায়ে এসে পড়্‌বে।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন ; তাহাতেই বা কি ? ইতিপূর্ব্বে ও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কায করিয়া গিয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায় ? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে, নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি ?

স্বামীজি। পরে কি হবে সর্ব্বদা একথাই যে ভাবে, তাহাদ্বারা কোন কার্য্যই হতে পারে না। তা যা বুঝেছিস্ এখনি কোরে ফেল্; পরে কি হবে, না হবে সেজন্য সত্য বলে সেকথা ভাব্বার দরকার কি? এতটুকু ত জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে সেকথায় কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর), যা হয় কোর্বেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগান বাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজিকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। স্বামীজি গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজির বিলাতি শিষ্য গুড্উইন সাহেব (Goodwin) মূর্ত্তিমান্ সেবার ন্যায় অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে নানা প্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজি শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—তুই কি কঠোপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করেছিস্?

শিষ্য। না মহাশয়; শঙ্করভাষ্য সমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজি। উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এখানা কণ্ঠে করে রাখিস্। নচিকেতার

ন্যায় শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আন্‌বার চেষ্টা কর্—শুধু পড়্‌লে কি হবে?

শিষ্য। কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ সকল অনুভূতি হয়!

স্বামীজি। ঠাকুরের কথা শুনেছিস্ ত?—তিনি বল্‌তেন, 'কৃপা বাতাস ত বইছেই, তুই পাল্ তুলে দেনা।' কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কি রে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জল বায়ু কেবল উহার সহায়কারী মাত্র।

শিষ্য। বাহিরের সহায়তারও ত আবশ্যক আছে মহাশয়?

স্বামীজি। তা আছে; তবে কি জানিস্—ভিতরে পদার্থ না থাক্‌লে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মানুভূতির একটা সময় আসে। কারণ, সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চ নীচ প্রভেদ করাটা, কেবল ঐ ব্রহ্ম বিকাশের তারতম্যে মাত্র। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, "কালেনাত্মনি বিন্দতি"।

শিষ্য। কবে আর, ঐরূপ হইবে, মহাশয়? শাস্ত্রমুখে শুনি কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি।

স্বামীজি। ভয় কি! এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস্—তখন এইবারেই হয়ে যাবে। মুক্তি—সমাধি—এসব কেবল ব্রহ্ম প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দূর করে দেওয়া মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্য্যের মত সর্ব্বদা জ্বল্‌ছে। অজ্ঞানমেঘে তাকে

ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি অবস্থা হওয়া। যত পথ দেখ্‌ছিস্‌ সবই এই পথের প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে যেভাবে আত্মানুভব করেছে সে সেই ভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। ইহাতে সর্ব্বজাতি—সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। ইহাই—সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রের ঐ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছট্‌ ফট্‌ করে।

স্বামীজি। এরই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে ততই প্রতিবন্ধরূপ মেঘ কেটে যাবে। ততই শ্রদ্ধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবেন্‌।

অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চল্‌তে পারে। কতকগুলি বিধি নিষেধ সকলেই পালন কত্তে পারে কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা। গোপীদিগের ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যেমন উদ্দাম-উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদিগের মনেও একটু একটু পুরুষ মেয়ে ভেদ ছিল। ঠিক্‌ ঠিক্‌ আত্মজ্ঞানে লিঙ্গভেদ একেবারেই নাই। বলিতে বলিতে 'গীত

গোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। কিন্তু জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে gingling of words এর (শ্রুতিমধুর বাক্য বিন্যাসের) দিকে বেশী নজর রেখেছেন। দ্যাখ্ দেখি গীত গোবিন্দের "পততি পতত্রে" ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ ব্যাকুলতার কি culmination (পরাকাষ্ঠা) কবি দেখিয়েছেন্? আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই। প্রাণের ভিতরটা ছট্ ফট্ করা চাই। আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও দ্যাখ্—অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গভীর—শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জ্জুনকে গীতা বল্‌চেন্!—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, যুদ্ধ কর্‌তে লাগিয়ে দিচ্ছেন!

এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হইয়াও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্ম্মহীন!—অস্ত্র ধরিলেন না! যে দিকে চাইবি দেখ্‌বি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র perfect (সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)! জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ তিনি যেন সকলেরই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই; এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখ্‌লে চল্‌বে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা! তবে ত লোকে মহা উদ্যমে কর্ম্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠ্‌বে।

আমি বেশ্ কোরে বুঝে দেখেছি এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic, (পাশবিক দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক-বিকার অথবা উন্মাদ-গ্রস্ত)। মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল—না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব—পরলোকে নরক!

শিষ্য। পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সাত্ত্বিক হইবে?

স্বামীজি। নিশ্চয়; মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না ত কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার মেঘদূতের "বিদ্যুদ্বন্তঃ ললিতবসনাঃ" ইত্যাদি চিত্র মনে পড়ে। আর তোদের ভোগের ভিতর হচ্ছে কি, না সেঁত্‌সেঁতে ঘরে ছেঁড়া কেঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মত বংশবৃদ্ধি!—Begetting a band of famished beggars and slaves—(ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া)! তাই বল্‌চি, এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মপ্রাণ কর্‌তে হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—এখন আর 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়', উহা ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য পথ নাই।

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজি। ছিলেন না? এই ত ইতিহাস বল্‌ছে, তাঁরা কত দেশ জয় করে তাতে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, জাপানে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভিতর দিয়ে না গেলে উন্নতি হবার যো আছে কি?

কথায় কথায় রাত্রি আগত হইয়াছে। এমন সময় Miss Muller আসিয়া পঁহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ রমণী; স্বামীজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজি শিষ্যকে ইঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই Miss Muller উপরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজি। দেখ্‌ছিস্ কেমন বীরের জাত এরা?—কোথায় বাড়ী ঘর! বড় মানুষের মেয়ে! তবু ধর্ম্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে!

শিষ্য। হাঁ মহাশয়! আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভুত। কত সাহেব মেম আপনার সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত! এ্কালে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা!

স্বামীজি। (আপনার দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে তবে আরো কত কি দেখ্‌বি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দিব। মান্দ্রাজে জন কতক আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscleএ (শরীরে) শক্তি নাই। Brain

ও muscles (শারীরিক মাংসপেশীসমূহ) সমান ভাবে develop (পূর্ণাবয়বসম্পন্ন) হওয়া চাই। Iron nerves with an well intelligent brain—and the whole world is at your feet, (দৃঢ়বদ্ধ শরীর ও বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন হলে জগৎকে পদানত করা যায়)।

সংবাদ আসিল, স্বামীজির খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্ আমার খাবার দেখ্‌বি।' আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—"মেলাই তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচী হতে রুটী ভাল। লুচী রোগীর আহার। মাছ মাংস fresh vegetable (তাজা তরি তরকারি) খাবি। মিষ্টি কম।" বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে কখানা রুটী খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?" কত খাইয়াছেন তাহা স্মরণ নাই, ক্ষুধা আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না! কথা কহিতে কহিতে শরীরজ্ঞান এতটা কমিয়া গিয়াছে!

আরও কিছু খাইয়া স্বামীজি আহার শেষ করিলেন। শিষ্যও বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ী না পাওয়ায় পদব্রজেই চলিল। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিবে।

তৃতীয় বল্লী।

স্থান—কাশীপুর ; ৺গোপাল লাল শীলের বাগান।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজির অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ।—কলিকাতার বড়বাজার পল্লীর বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণের স্বামীজিকে দেখিতে আগমন—পণ্ডিতগণের সহিত স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রালাপ—স্বামীজির সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ধারণা—গুরু-ভ্রাতাগণের স্বামীজির প্রতি ভালবাসা—সভ্যতা কাহাকে বলে—ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশেষত্বঃ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মিলনে নবযুগাবির্ভাব—পাশ্চাত্যে ধার্ম্মিক লোকের বাহ্যিক চালচলন সম্বন্ধে ধারণা—ভাব-সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রভেদ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবরাজ্যের রাজা—ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষই যথার্থ লোকগুরু—কুলগুরু প্রথার অপকারিতা—ধর্ম্মগ্লানি দূর করিতে ঠাকুরের আগমন—স্বামীজি, পাশ্চাত্যে ঠাকুরকে কি ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েক দিন কাশীপুরে ৺ গোপাল লাল শীলের বাগানে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্য তখন প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিত। শুধু শিষ্য কেন, স্বামীজির দর্শন মানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের তথায় ভিড় হইত। Miss Muller স্বামীজির সঙ্গে আসিয়া এখানেই প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্যের গুরুভ্রাতা Goodwin (গুড্উইন্ সাহেব) এই বাগানেই স্বামীজির সঙ্গে থাকিতেন।

স্বামীজির সুখ্যাতি তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী

হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজির জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিতে, তখন স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিত।

শিষ্য দেখিয়াছে, প্রশ্নকর্ত্তারা স্বামীজির শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিত! স্বামীজির কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। এই বাগানে অবস্থান কালে তাঁহার অলৌকিক যোগদৃষ্টিরও সময়ে সময়ে পরিচয় পাওয়া যাইত।*

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। অর্থবান্ মাড়োয়ারী বণিক্‌গণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। ঐ সকল বেদজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণও এ সময়ে স্বামীজির সুনাম অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজির সঙ্গে তর্ক করিবার মানসে একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন তথায় উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজিকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ

---

* এই বাগানে অবস্থান কালে স্বামীজি একদিন একটী প্রেতাত্মার ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পান। সে যেন করুণকণ্ঠে সদ্যোমৃত্যুর মুখ হইতে প্রাণ ভিক্ষা করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া, স্বামীজি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্য সত্যই ঐ বাগানে কোন ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা তিনি পরে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের কাছে প্রকাশ করেন।

করিলেন। স্বামীজিও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। কোন্ বিষয় লইয়া স্বামীজির সঙ্গে সেদিন পণ্ডিতগণের বাদানুবাদ হয়, তাহা শিষ্যের ইদানীং স্মরণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে, পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজিকে দার্শনিক কূট প্রশ্ন সমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজি প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজির সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতি-মধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজিকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান কালে স্বামীজি যে সংস্কৃত আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এই সকল পণ্ডিতগণের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজির মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, যোগানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ স্বামী মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজি পণ্ডিতগণের সহিত বাদে সিদ্ধান্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষবাদী হইয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজি এক স্থলে "স্বস্তি" স্থলে "অস্তি" প্রয়োগ

করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলেন "পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনং"—আমি পণ্ডিতগণের দাস; আমার এই ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরাও স্বামীজির ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পরিশেষে সিদ্ধান্ত পক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই চারিজন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ, স্বামীজিকে কিরূপ বোধ হইল?" তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা; মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভা বলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।"

স্বামীজির উপর তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সর্ব্বদা কি অদ্ভুত ভালবাসাই দেখা যাইত! পণ্ডিতগণের সঙ্গে স্বামীজির যখন খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে হলের উত্তর পাশের ঘরে বসিয়া শিষ্য জপ করিতে দেখিতে পায়। পণ্ডিতগণের গমনান্তে শিষ্য তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারে যে, স্বামীজির জয়লাভের জন্যই তিনি একান্ত মনে ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাইতেছিলেন!

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে শিষ্য, স্বামীজির নিকট শ্রবণ করে যে, পূর্ব্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজি উত্তরমীমাংসা পক্ষ অবলম্বনে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান-

কাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও স্বামীজির সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটী ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে স্বামীজিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বামীজি বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা না বলায় তাঁহার ওরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষার্পণ করেন নাই। ঐ বিষয়ে স্বামীজি ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছাড়িয়া ঐরূপে ভাষায় সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্যজ্ঞাপক। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই লয়—ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। "তোদের দেশে কিন্তু খোসা লইয়াই মারামারি চল্‌ছে,—ভিতরকার শস্যের কেউ অনুসন্ধান করে না!"—এই বলিয়া স্বামীজি শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল। তত্রাচ তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজির অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত।

"সভ্যতা" কাহাকে বলে—তদুত্তরে সেদিন স্বামীজি বলেন যে, যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন

সভ্যতা সর্ব্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিয়া লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করিতে না পারিলেও অনেকটা কমাইতে, নিঃসন্দেহ সমর্থ হইয়াছিল। ইদানীন্তনকালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্ম্ম-তৎপর হইতে হইবে, অপরদিকে তাহাকে তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যোন্য সংমিশ্রণে জগতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে, একথা স্বামীজি সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্ম্মপরায়ণ হবে, সে বাহিরের চাল-চলনে তত গম্ভীর হবে; মুখে অন্য কথাটী থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্ম্মকথা শুনে ওদেশের ধর্ম্মযাজকেরা যেমন অবাক্ হয়ে যেত, বক্তৃতান্তে বন্ধুবান্ধবদের সহিত ফষ্টি নাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক্ হয়ে যেতো। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেল্‌তো, 'স্বামীজি, আপনি একজন ধর্ম্মযাজক; সাধারণ লোকের মত এরূপ হাসি তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ওরূপ চপলতা শোভা পায় না।' তদুত্তরে আমি বলিতাম, 'We are children of bliss—why should we look morose and somber?' (আমরা আনন্দের সন্তান; আমরা বিরসবদনে থাক্‌বো কেন?) ঐ কথা শুনে তারা মর্ম্মগ্রহণ করতে পার্‌ত কিনা সন্দেহ।"

সেদিন স্বামীজি ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও নানা কথা বলিয়াছিলেন। যতদূর সাধ্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা গেল।

"মনে কর একজন হনুমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা কর্‌ছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাক্‌বে, ঐ সাধকের চলন বলন ভাবভঙ্গী এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আস্‌বে। "জাত্যন্তরপরিণাম" ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে তদাকারকারিত হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই 'ভাবসমাধি'। আর, 'আমি দেহ নই', 'মন নই', 'বুদ্ধি নই', এইরূপে 'নেতি' 'নেতি' কর্‌তে কর্‌তে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হলে নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছুতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে। ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারোটী ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন! ভাব-মুখে না থাক্‌লে তাঁর শরীর থাকিত না—একথাও ঠাকুর বল্‌তেন।"

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়, ওদেশে কিরূপ আহারাদি করিতেন?

স্বামীজিঃ—ওদেশের মতই খেতুম। আমরা সন্ন্যাসী; আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।

এদেশে তিনি ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তৎসম্বন্ধেও ঐদিন স্বামীজি বলেন যে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটী কেন্দ্র করিয়া সর্ব্ববিধ লোক-কল্যাণার্থ নূতনধরণে সাধুসন্ন্যাসী তৈয়িরি করিবেন। আরও বলিলেন, destruction দ্বারা বা

প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম destructive (প্রাচীন রীতিনীতির ধ্বংসকারী) ছিল। সেই জন্য ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

শিষ্যের মনে হয়, স্বামীজি ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন—একটী জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। একথা সর্ব্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা—স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই দেশে উহার প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মের এই সকল গ্লানি দূর করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমানযুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সার্ব্বভৌমিক মত জগতে প্রচারিত হইলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হইবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বামীজির একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "ওদেশে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলেন না কেন?"

স্বামীজি ঃ—ওরা দর্শন বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পার্‌লে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কে থেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আস্‌তো, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম্। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বল্লে ওরা বোল্‌তো—"ও আর তুমি নূতন কি বলছো—আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।"

তিন চারি ঘণ্টাকাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সে দিন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

চতুর্থ বল্লী।

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী
রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
বর্ষ—১৮৯৭ (মার্চ্চ মাস)

বিষয়—নবগোপাল বাবুর বাটীতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা—স্বামীজির দীনতা—নবগোপাল বাবুর পরিবারস্থ সকলের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম মন্ত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষজা মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত বাটীর নিমিত্ত জমী ক্রয় করিবার সময় স্থানটির 'রামকৃষ্ণপুর' নাম জানিয়া, তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ, ঐ গ্রামের নামের সহিত তাঁহার ইষ্টদেবের নাম জড়িত। বাড়ী তৈয়ারি হওয়ার কয়েকদিন পরেই স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। ঘোষজা ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজিদ্বারা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। ঘোষজা মঠে যাইয়া ঐ কথা কয়েকদিন পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষে উৎসব—মঠধারী সন্ন্যাসী ও ঠাকুরের গৃহীভক্তগণ সকলেই আজ

তথায় ঐজন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাড়ীখানি আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত—সাম্‌নের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমাল্যের সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজি সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজির পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্বাস, মাথায় পাগ্‌ড়ী—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজি "দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো কোরে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে" গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। আর দুই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে দলটি শ্রীযুক্ত রামলাল ডাক্তার বাবুর বাড়ীর কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়াইল। রামলাল বাবুও শশব্যস্তে বাটীর বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামীজি কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল, তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে, মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে

আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজির এই অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গম্যপন্থা মুখরিত করিতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপাল বাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজি মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোরসিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর ঠাকুর পূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজি দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমাদের সাধ্য কি যে,

ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামীজি তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেল পাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম; যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাক্‌বেন?" সকলেই স্বামীজির কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজি, সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজকের আসনে বসিয়া, ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাগিলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজির কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজি, পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপে রচনা করিয়া দিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটী স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। নীচে সমাগত ভক্তমণ্ডলী অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কীর্ত্তন

আরম্ভ করিলেন। স্বামীজি উপরেই রহিলেন; বাড়ীর মেয়েরা স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শিষ্য পরিবারস্থ সকলের রামকৃষ্ণগতপ্রাণতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ইঁহাদিগের সঙ্গে আপন নরজন্ম সার্থক বোধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভক্তগণ, প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে নীচে গিয়া, খানিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাগমে সেই ভক্তসঙ্ঘ ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। শিষ্যও স্বামীজির সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া, রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম বল্লী।

স্থান—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও আলমবাজার মঠ।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ, মার্চ্চ মাস।

বিষয়—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শেষ জন্মোৎসব—ধর্ম্মরাজ্যে উৎসব পার্ব্বণাদির প্রয়োজন—অধিকারিভেদে সকল প্রকার লোকব্যবহারের আবশ্যকতা—স্বামীজির ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য, একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন নহে।

স্বামীজি যে সময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রথমবার ফিরিয়া আসেন, তখন আলমবাজারে রামকৃষ্ণ-মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের বাড়ীটাকে লোকে 'ভূতের বাড়ী' বলিত। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে ঐ ভূতের বাড়ী রামকৃষ্ণতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তথায় কত সাধনভজন, কত জপতপস্যা, কত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ ও নামকীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার আর পরিসীমা নাই। কলিকাতায় রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়া স্বামীজি ঐ ভগ্ন মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর, কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একমাস কাল থাকিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগান বাটীতে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সে স্থানেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিয়া দর্শনোৎসুক জনসঙ্ঘের সহিত ধর্ম্মালাপাদি করতঃ তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী। দক্ষিণেশ্বরে রাণী

রাসমণির কালীবাড়ীতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। রামকৃষ্ণসেবকগণের ত কথাই নাই, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ ও উৎসাহের পরিসীমা নাই। কারণ, বিশ্ববিজয়ী স্বামীজি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া এ বৎসর প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ আজ তাঁহাকে পাইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গসুখ অনুভব করিতেছেন। কালী-মন্দিরের দক্ষিণে প্রসাদ প্রস্তুত হইতেছে। স্বামীজি তাঁহার কয়েক জন গুরুভ্রাতৃ-গণসহ বেলা ৯টা—১০টা আন্দাজ উপস্থিত হইয়াছেন। নগ্ন পদ; শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দিত রূপ দর্শন করিবে, সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে ও তাঁহার শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। তাই আজ আর স্বামীজির তিলার্দ্ধ বিশ্রামের সময় নাই। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামীজি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের বাসগৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ীর সর্ব্বত্র দিঙ্‌মুখসকল মুখরিত হইতেছে। শতসহস্র দর্শককে ক্রোড়ে করিয়া বার বার কলিকাতা হইতে হোর্‌মিলার কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্শ্বদ-

গণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছেন। এবারকার এই উৎসব প্রাণে বুঝিবার জিনিষ—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে!

স্বামীজির সহিত আগত দুইটী ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় শিষ্যের এখনও হয় নাই। স্বামীজি তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। স্বামীজির সঙ্গে এখনও তেমন বিশেষ পরিচয় না হইলেও শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ উৎসবসম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজির হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজিও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আরো লিখ্‌বে।"

পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু* পঞ্চবটীর উত্তরদিকে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণগুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনসমভিব্যাহারে স্বামীজি গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া "এই যে—ঘোষজা!" বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করযোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশবাবুকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজি বলিলেন, "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন"! গিরিশবাবুও স্বামীজির কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—"তা বটে; তবু এখনো সাধ যায়,

* মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আরো দেখি।” এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইল, তাহার মর্ম্ম বাহিরের লোকের অনেকেই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজি পঞ্চবটীর উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজি চলিয়া যাইলে গিরিশবাবু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —“একদিন হরমোহন (মিত্র) কি খবরের কাগজ দেখে এসে বল্লে যে, স্বামীজির নামে আমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলেম, ‘নরেন্‌কে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্যায় কর্‌তে দেখি, তবে বল্‌বো, আমার চক্ষের দোষ হয়েছে—চোক্ উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো। ওরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে? ওদের যে কেউ দোষ ধর্ত্তে যাবে, তাদের নরক হবে।” এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আসিলেন এবং একটা থেলো হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে কলম্বো থেকে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণে শ্রীস্বামীজিকে যে অপূর্ব্বভাবে আদর অভ্যর্থনাদি করিয়াছে ও তিনি তাহাদের যে সকল অমূল্য উপদেশ বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছেন, তাহার কতক কতক বর্ণন করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীর সর্ব্বত্রই একটা দিব্য ভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু

বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজি লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও শ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে দূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা ৩টার পর স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "একখানা গাড়ী ছাখ্—মঠে যেতে হবে।" অনন্তর আলমবাজার পর্য্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজি স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "কেবল abstract idea (জীবনে ও কার্য্যে অপরিণত ভাব) নিয়ে পড়ে থাক্‌লে কি হবে? এই সকল উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে ত massএর ভেতর এই সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ—এর মানেই হচ্ছে, ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়।

সেজন্য ওগুলি ধর্ম্মের বহিরাবরণ, প্রকৃত ধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

কিন্তু যারা 'ধর্ম্ম' কি, 'আত্মা' কি, এসব কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারে না—তারা ঐ উৎসব আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম্ম বুঝ্‌তে চেষ্টা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে, তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাব্‌বে। যাঁর নামে এত লোক একত্রিত হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক আসিল কেন—একথা তাদের মনে উদয় হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্ত্তন দেখ্‌তে, ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ, বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব কীর্ত্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হতে পারে কি? আমাদের দেশে ষষ্ঠী পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্য্যন্ত লোকে ঐ সকল করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই,—এমন লোক ত দেখিলাম না, যে ঐ সকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল।

স্বামীজি। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্ম্মবীর জন্মেছিলেন—তাঁরা ত সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন ও অত বড় হয়েছেন? ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন

আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংস্থিতির জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য। লোকদেখানো মানিতে পারেন। কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐ সকল বাহ্যিক লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজি। কেন পারিবে না? সত্য বলিতে আমরা যা বুঝি তাহাও ত relative—দেশ কাল:পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন? অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে, অধিকারী ভেদে। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও কালিয়ে রেঁধে দেন; কোন ছেলেকে বা সাগু পথ্য দেন—সেইরূপ।

শিষ্য কথাটী এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আলমবাজার মঠে উপস্থিত। শিষ্য গাড়ীভাড়া দিয়া স্বামীজির সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজির পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। স্বামীজি জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন। এবং মেজেতে পাতা সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এমন ভিড় উৎসবে আর কখন হয়নি। যেন ক'ল্‌কাতাটা ভেঙ্গে এসেছিল।"

স্বামীজি। তা হবে না? এর পর আরো কত কি হবে।

শিষ্য। মহাশয়, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই দেখা যায়—কোন না কোন

বাহ্যিক উৎসব আমোদ আছেই। কিন্তু কাহারো সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা সহরে দেখিয়াছি, সিয়াসুন্নিতে লাঠালাঠি হয়।

স্বামীজি। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখান্‌কার ভাব কি জানিস্? সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মান্‌তেন—আবার বলিতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেখ্‌লে ও সকলি মিথ্যা মায়া মাত্র।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের সকল ধর্ম্মকেই তিনি বহু মান দিতেন।

স্বামীজি। তুই কি করে জান্‌লি, আমরা সকল ধর্ম্মমতকে ঐরূপে বহু মান দিই না?

এই বলিয়া স্বামীজি নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওরে, এ বাঙ্গাল বলে কি?"

শিষ্য। মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐকথা আমায় বুঝাইয়া দিন্।

স্বামীজি। তুই ত আমার বক্তৃতা পড়েছিস্। কৈ, কোথায় ঠাকুরের

নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য। তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান্ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন ইতর সাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন্ না।

স্বামীজি। আমি যা বুঝেছি, তা বল্ছি। তুইও যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম্ম বলে বুঝে থাকিস্, তা হলে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য। আগে অনুভব করিব, তবে ত বুঝাইব। ঐ মত আমি সুধু পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজি। তবে আগে অনুভূতি কর্। তার পরে লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন, লোকে প্রত্যেকে যে, এক একটা মতে বিশ্বাস কোরে চলে যাচ্ছে—তাতে তোর তো বল্বার কিছু অধিকার নাই। কারণ, তুইও ত এখন তাদের মত একটা ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে চলেছিস্ বই ত নয়।

শিষ্য। হাঁ—আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজি। শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হলে, বাইবেল্ জেন্দাবস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মত উহারা ত আর প্রাচীন গ্রন্থ নহে। আবার আত্ম-তত্ত্ব-

সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন ত আর কোথাও নাই।

স্বামীজি। বেশ, তোর কথা নয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নাই, এ কথা বল্‌বার তোর কি অধিকার?

শিষ্য। বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে; তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মেনে যাব। আমার এতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজি। তা কর্, তবে আর কারো যদি ঐরূপ কোন মতে 'খুব' বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস্। দেখ্‌বি—পরে তুই ও সে এক যায়গায় পঁহুছিবি। মহিম্ন-স্তবে পড়িস্‌নি?—"ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

ষষ্ঠ বল্লী।

স্থান—আলমবাজার মঠ।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ, মে মাস।

বিষয়—স্বামীজির শিষ্যকে দীক্ষা দান—দীক্ষার পূর্ব্বে প্রশ্ন—যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদের কথা—আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ চিন্তনে যাহাতে সর্ব্বদা মনকে নিবিষ্ট রাখে তাহাই দীক্ষা—পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি অহং ভাব হইতে—ক্ষুদ্র আমিত্বের ত্যাগেই আত্মার প্রকাশ—মনের লোপেই যথার্থ আমিত্বের প্রকাশ—সেই আমির স্বরূপ—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।'

স্বামীজি দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শক নাগ মহাশয় তাহাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই এবং মন্ত্র গ্রহণের কথা তুলিলে স্বামীজির কথা পাড়িয়া তাহাকে বলিতেন—"স্বামীজি মহারাজই জগতের গুরু হইবার যোগ্য!" দীক্ষা গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া শিষ্য সেজন্য স্বামীজিকে দার্জ্জিলিঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজি তদুত্তরে লিখেন—"নাগ মহাশয়ের আপত্তি না হইলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করিব।" চিঠিখানি শিষ্যের নিকটে এখনও আছে।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজি আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ দিন! শিষ্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজি রহস্য করিয়া বলিলেন, "আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে—না ?"

স্বামীজি শিষ্যকে ঐকথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়, এ সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—"আমি তোকে যখন যে কাজ কর্‌তে বোল্‌বো, তখনি তা যথাসাধ্য কর্‌বি ত ? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই কর্‌তে বলি, তাহলে তাও অবিচারে কর্‌তে পার্‌বি ত ? এখনও ভেবে দেখ্; নইলে সহসা গুরু বলে গ্রহণ কর্‌তে এগুস্‌ নি।" এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজি শিষ্যের মনের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে "পারিব" বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—'যিনি এই সংসার-মায়ার পারে

নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা সমিৎপাণি হয়ে গুরুর আশ্রমে গমন কর্‌ত। গুরু—অধিকারী বোলে বুঝ্‌লে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন এঁটে বেঁধে রাখ্‌ত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য। তবে কি, মহাশয়, আমাদের ন্যায় সূতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজি। বেদে কোথায়ও সূতোর পৈতের কথা নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও লিখেছেন—"অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ"। সূতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নাই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে "উপনয়ন" বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে। শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রীআচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল্‌। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্‌ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর্‌। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন্‌। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা, আত্মতত্ত্ব জান্‌বার জন্য, আত্মার উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়,

তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে—কতক গুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সৰ্ব্বস্ব ত্যাগরূপ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস্ দান কর্। শাস্ত্রে বলে, যারা অধীত-বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—"নাত্র কার্য্যা বিচারণা"। এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"।

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজি আজ গঙ্গায় না যাইয়া বাড়ীতেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতঃ পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজি ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজি ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন—ঈষন্মুদ্রিত-নয়ন, যেন দেহ-মনপ্রাণ সকলি স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজি শিষ্যকে "বাবা আয়" বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজির সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—"দোরে খিল দে।" সেইরূপ করা হইলে বলিলেন—"স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।" স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার

হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বভাবে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজি তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দান করিলে, মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া, স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শিষ্যের মন এখন স্তব্ধ ও একাগ্র হওয়ায় সে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল ; কতক্ষণ এভাবে কাটিল, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজি বলিলেন—"গুরুদক্ষিণা দে।" শিষ্য বলিল—"কি দিব ?" শুনিয়া স্বামীজি অনুমতি করিলেন—"যা ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।" শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজির হস্তে সেগুলি দিবামাত্র স্বামীজি একটী একটী করিয়া সেই লিচুগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'যা তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।' শিষ্য ঠাকুরঘরে স্বামীজির নিকটে যখন দীক্ষিত হইতেছিল, তখন মঠের অপর এক ব্যক্তি সহসা দীক্ষিত হইতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচারী রূপে মঠভুক্ত হইলেও ইতিপূর্ব্বে তান্ত্রিকীদীক্ষা গ্রহণ করেন নাই ; শিষ্যকে অদ্য ঐভাবে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া তিনিই এখন ঐবিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর

হইতে নির্গত হইবা মাত্র ঐঘরে স্বামীজির নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীজিও শুদ্ধানন্দের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়া পুনরায় পূজার আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শুদ্ধানন্দকে দীক্ষা দান করিয়া স্বামীজি কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতিমধ্যে শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজির পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসম্বাহনে নিযুক্ত রহিল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজি উপরের বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল ?

স্বামীজি। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি তুমি' ভাব, যা থেকে এই সব ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বন্দ্বভাবসকল এসেছে, কমে যায়। আমা থেকে অমুক ভিন্ন এই ভাবটা ত মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক মোহ থাকে না—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"।

যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্ব্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়।

তাই দুর্ব্বলতা বা weaknessএরই নাম পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল জ্বল কর্‌ছে!—সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূত-কিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' কর্‌ছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া। ঐ অধ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থ-ভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্ত্তমান।

শিষ্য। তাহা হইলে এই সকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?

স্বামীজি। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর, যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ:পাপ বলে, সেটা weaknessএর ফল—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন আমি আত্মা এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বল্‌তেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

শিষ্য। মহাশয় 'আমি' টা মরিয়াও মরে না। এটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজি। এক ভাবে খুব কঠিন আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস্? যে জিনিস্‌টে নাই, তার আবার মরামরি কি? আমিত্বরূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূত্‌টা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ও দেখা যায়, এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব

পর্য্যন্ত সকলে রয়েছেন। এইটি জান্‌তে হবে, প্রত্যক্ষ কর্‌তে হবে। এর যত কিছু সাধনভজন—ঐ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য্য আপনার প্রভায় আপনি জল্‌চে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিস্‌টে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি করে জান্‌তে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বল্‌ছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" তুই যা কিছু জান্‌ছিস্‌, তা মনরূপ কারণসহায়ে। মন ত জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য্য হয়। সুতরাং মনদ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জান্‌বি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌঁছুতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছুতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্য্যন্ত। তারপর মন যখন বিকল্প বা বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয়, ও তখনই আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর "অপরোক্ষানুভূতি" বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনটাই ত 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমিটা'ও তো আর থাকিবে না।

স্বামীজি। তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বের' স্বরূপ। তখন যে আমিটা থাকবে, সেটা সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বগ—সর্ব্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙ্গে মহাকাশ—ঘট ভাঙ্গ্‌লে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র

আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে কর্‌ছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্ব্বগত আমিত্ব বা আত্মা রূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব .মনটা রহিল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি ?

যা বল্‌ছি তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।' শ্রবণ মনন কত্তে কত্তে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে—আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাক্‌বে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজি আস্তে আস্তে ধূম পান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন—"এই সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝ্‌তে পার্‌ছে না!—আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকৃতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে এই দুর্লভ মানুষ জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য্য প্রভাব! মা! মা!!"

সপ্তম বল্লী।

স্থান—কলিকাতা।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ, মার্চ্চ ও এপ্রিল।

বিষয়—স্বামীজির স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত—মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন ও প্রশংসা—ভারতের স্ত্রীলোকদিগের অন্য দেশের সহিত তুলনায় বিশেষত্ব—স্ত্রীপুরুষ সকলকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য—সামাজিক কোন নিয়ম জোর করিয়া ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই, শিক্ষার প্রভাবে লোকে মন্দ নিয়মগুলি স্বতঃই ছাড়িয়া দিবে।

স্বামীজি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের ৺ বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতে ঘুরিয়াও বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজির কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজি ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, "চল্—আমার সঙ্গে যাবি"—বলিতে বলিতে স্বামীজি নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে উঠিলেন; গাড়ি দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য। মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজি। চল্ না—দেখ্‌বি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন তদ্বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না

বলিয়া গাড়ী বিডনষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "তোদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্চিস্, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত কত্তে তোরা কি কচ্ছিস্?"

শিষ্য। কেন মহাশয়, আজ কাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম্ এ, বি এ, পাশ করিতেছে।

স্বামীজি। ও ত বিলিতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? তা আবার মেয়েদের ভিতর! দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, সেজন্য গবর্ণমেণ্টের statisticsএ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন) ও হবে না।

তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখা পড়া শিখেছিস্—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখ্তে পাই না। কিন্তু জানিস্, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার যো নাই। সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে—কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈয়ারি

কোর্‌বো। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে massএর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর্‌বে। কিন্তু দেশী ধরণে ঐকাজ কত্তে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) কত্তে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র কত্তে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার লবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ কত্তে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈয়িরি হয়, তাই কত্তে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ কত্তে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (কাজ কর্‌বার যন্ত্র) করে তুলেছিস্‌। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হলো? মেয়েদের আগে তুল্‌তে হবে, massকে (আপামর সাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্টীট্রের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের— রাস্তায় চল্‌।' গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজি শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, মহাকালী পাঠশালার স্থাপনকর্ত্রী

তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে ৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর কিছু পূর্ব্বদিকে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজিকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিল। এবং মাতাজির আদেশে প্রথমতঃ শিবের ধ্যান সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। পরে, কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজির আদেশে কুমারীগণ তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজিও উৎফুল্ল নয়নে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজি স্বামীজির সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন না বলিয়া স্কুলের দুই তিনটী শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজিকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজি সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজির নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি মাতাজির একজন কুমারীকে তথায় ডাকিয়া আনাইলেন এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজিকে শুনাইল। স্বামীজি শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকল্পে অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজি তাহাতে বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি ভগবতীজ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।"

বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা সমাপন করিয়া স্বামীজি বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজি স্কুল সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহি (Visitor's book) খানিতে স্বামীজিকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজিও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ লাইনটী শিষ্যের এখনো মনে আছে। তাহা এই,—The movement is in the right direction."

অনন্তর মাতাজিকে অভিবাদনান্তে স্বামীজি পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজি। এঁর (মাতাজির) কোথায় জন্ম!—সর্ব্বস্ব ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে —ঐটে ভাল বোধ হলো না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণি-গণের উপরেই স্কুলের শিক্ষাভারটা সর্ব্বথা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংশ্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গার্গী, খনা, লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কৈ ?

স্বামীজি। দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নাই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্য ক্ষেত্র ভারতে এখনো মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব—স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও ত তেমন দেখলুম্ না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হতো না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! ট্রাম চালাচ্ছে, আফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসারি কচ্ছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নত কত্তে পার্‌লিনে! এদের ভিতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা কর্‌লিনে! ঠিক্ ঠিক্ শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য। মহাশয়, মাতাজি ছাত্রীদিগকে যে ভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয় ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে পারিলে, তবে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত।

স্বামীজি। ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখন

জন্মায় নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখ্‌তে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে —সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন কর্‌বার্ সময় সমাজের নেতারা লাখ লোক জড় করে চেঁচাতে লাগলো "আমরা আইন চাই না!"—অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাক্‌তো ও ভাব্‌তো—আমাদের সমাজে এখনো এ হেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজি। কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য। এই দেখুন্, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে, তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্ম্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম্মনিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজি। অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে

মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিতা হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মিবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা, তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্যবিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্য্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি কল্‌কাতায় অনেক স্থলে শ্বাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আল্‌তা পরিয়া বসিয়া থাকে! আমাদের বাঙ্গাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজি। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নাই। আমাদের কার্য্য হচ্ছে—স্ত্রী, পুরুষ, সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া, সেই শিক্ষার ফলে—তারা নিজেরাই কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে, ও আপনারাই মন্দটা করা ছেড়ে দিবে। তখন আর জোর করে সমাজে কোন বিষয় ভাঙ্গ্‌তে গড়্‌তে হবে না।

শিষ্য। স্ত্রীলোকদিগের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজি—ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, শেলাই, শরীর-পালন—সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটী অনেকটা ঠিক্ পথে চলেছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রসকল ছাত্রীদের সাম্‌নে সর্ব্বদা ধরে উচ্চত্যাগরূপ ব্রতে তাহাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত কর্‌তে বল্‌তে হবে।

গাড়ী এইবার বগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিল। স্বামীজি অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে নূতন গঠিত "রামকৃষ্ণ মিশনের" সভ্যদিগের কি কি কাজ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে "বিদ্যাদান" ও "জ্ঞানদানের" শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে,) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "যেন প্রহ্লাদের দলে যাস্‌নি।"

ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন, "শুনিস্‌নি? 'ক' অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে? অবশ্য প্রহ্লাদের চখে প্রেমে জল এসেছিল ও মুর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে।" ভক্তদের ভিতরেও অনেকে ঐরকমের আছে। সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার যখন যেদিকে ঝোঁক্ উঠ্‌বে—তার একটা হেস্ত নেস্ত না হলে ত আর শান্তি নাই; এখন যা ইচ্ছা হচ্ছে, তাই হবে।"

অষ্টম বল্লী।

স্থান—কলিকাতা।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজিকে শিষ্যের রন্ধন করিয়া ভোজন করান—ধ্যানের স্বরূপ ও অবলম্বন সম্বন্ধে কথা—বহিরালম্বন ধরিয়াও মন একাগ্র করিতে পারা যায়—মন একাগ্র হইবার পরেও সাধকের মনে বাসনার উদয় পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে—মনের একাগ্রতায় সাধকের ব্রহ্মাভাস ও নানা প্রকার বিভূতি লাভের দ্বার খুলিয়া যায়—ঐ সময়ে কোনরূপ বাসনাদ্বারা চালিত হইলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

কয়েক দিন হইল, স্বামীজি বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিরাম নাই; কারণ, বহু উৎসাহী যুবক—কলেজের বহু ছাত্র, তিনি এখন যেখানেই থাকুন্ না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে, স্বামীজি সকলকেই সাদরে ধর্ম্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজির প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্য্যগ্রহণ—সর্ব্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা

করিতেছেন। স্বামীজির কিন্তু গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজিকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজির আদেশ। মাছ, তরকারী ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সে ৺বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, "তোদের দেশের মত রান্না কত্তে হবে; আর, গ্রহণের পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।"

বলরাম বাবুদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতরে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীনমাতা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধনসম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীজি মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখন বা "দেখিস্ 'মাছের জুল' যেন ঠিক বাঙ্গাল দিশি ধরণে হয়" বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, :মুগের দাল, কৈমাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তুনি, রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজি স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা করিয়া খাইতে বসিলেন। "এখনো রান্নার কিছু বাকী আছে," বলিলেও শুনিলেন না, আব্দেরে ছেলের মতন বলিলেন, "যা হয়েছে শীগ্গির নিয়ে আয়, আমি আর বস্তে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।" শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি

আগে স্বামীজিকে মাছের সুক্তুনি ও ভাত দিয়া গেল, স্বামীজিও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন! অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজিকে অন্য সকল তরকারী আনিয়া দিবার পর, যোগানন্দ-প্রেমানন্দ-প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না, কিন্তু স্বামীজি আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তুনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু তিনি সেই সুক্তুনি খাইয়া খুসী হইয়া বলিলেন—"এমন কখন খাই নাই! এই মাছের 'জুলটা' যেমন ঝাল হয়েছে—এমন কিন্তু আর কোনটাই হয় নাই।" টকের মাছ খাইয়া স্বামীজি বলিলেন, "এটা ঠিক্ যেন বর্দ্ধমানী ধরণে হয়েছে।" অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজি ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজির সম্মুখে দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজি তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে বলিলেন, "যে ভাল রাঁধ্‌তে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।"

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজি বলিলেন, "ওরে গেরণ লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে"; এই বলিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, "এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই

আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।" এই ভেবে শিষ্য শান্তমনে স্বামীজির পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইয়া ক্রমে চারিদিক্ সন্ধ্যাকালের মত তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজি উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে বলে, গেরণের সময় যে যা করে, সে তাই নাকি কোটিগুণে পায়—তাই ভাবলুম্, মহামায়া এ শরীরে সুনিদ্রা দেন নাই; যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি ত এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হলো না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।"

অনন্তর সকলে স্বামীজির নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজি শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতিপূর্ব্বে কখনো স্বামীজির সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক্ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজি ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিষ্য উঠিয়া "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল; পরে গুরুভক্তি ও ত্যাগের মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজি পুনঃপুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, "আহা! সুন্দর বলেছে।"

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন স্বামীকে স্বামীজি কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় 'ধ্যান' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর

স্বামী প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজি উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকী আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজি বলিলেন, "তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল্।"

শুদ্ধানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?"

স্বামীজি। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হোক্ না কেন, একাগ্র করিতে পারা যায়।

শিষ্য। শাস্ত্রে যে, বিষয় ও নির্ব্বিষয় ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি? এবং উহার মধ্যে কোন্‌টা বড়?

স্বামীজি। প্রথম কোন একটী বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস কর্ত্তে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনসংযম করিতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখ্‌তে পেতুম না, বা সাম্‌নে যে রয়েছে তা বুঝ্‌তে পার্‌তুম না, মন নিরোধ হয়ে যেতো—কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠ্‌তো না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখ্‌তে পেতুম। তাই মনে হয়, যে কোন সামান্য বাহ্যিক বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লেও মন একাগ্র বা ধ্যান হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবী মূর্ত্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়ে-

ছিল। যাক্ এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তন ও প্রচার করে গেছেন। তার পর কালে তাতে মনস্থির করতে হবে, একথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার যো নাই।

শিষ্য মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজি। বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা হয় বটে; কিন্তু পরে ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; তখন শুদ্ধ "অস্তি" এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য। মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজি। ওগুলি পূর্ব্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখন মারের অভ্যুদয় হলো। মার বলে একটা কিছু বাহিরে ছিল না, মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাহিরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য। তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

স্বামীজি। তা নয়ত কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝ্‌তে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নাই। এই যে জগৎ দেখছিস্, এটাও নাই। সকলি মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস দর্শন হয়। তখন "যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি" সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে ও কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ কোরে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি লাভ কোরে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি পুনঃ পুনঃ "শিব" "শিব" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, "ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। "সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং"।

নবম বল্লী।

স্থান—কলিকাতা।

বর্ষ—১৮৯৭।

বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া স্বামীজির কলিকাতায় 'রামকৃষ্ণ-মিশন' সমিতি গঠন করা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাব প্রচার সম্বন্ধে মতামত—স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি ভাবে দেখিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজিকে কি ভাবে দেখিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযোগানন্দ স্বামীর কথা নিজ ঈশ্বরাবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—অবতারত্বে বিশ্বাস করা কঠিন, দেখিলেও হয় না; একমাত্র কৃপাসাপেক্ষ—কৃপার স্বরূপ ও কীদৃশ ব্যক্তি উহা লাভ করে—স্বামীজি ও গিরিশবাবুর কথোপকথন।

স্বামীজি কয়েক দিন হইতে বাগবাজারে ৺ বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান করায়, ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়ীতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজির উদ্দেশ্য একটী সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজি বলিতে লাগিলেন :—

"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়ারি করা, বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ও সব

দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নহে। তারা গুণের সম্মান কর্‌তে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি এক জন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর যত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে—যখন, মত ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত কত্তে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কার্য্য চল্‌তে পার্‌বে। সেই জন্য এই সঙ্ঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চল্‌তে হবে। তার পর কালে সকলের মত লয়ে কার্য্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারি নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হোন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভাবী কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমরা উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য :—মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্বব্যাখ্যা

করিয়াছেন ও কার্য্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই "প্রচারের" (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত ঃ—জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই "প্রচারের" (মিশনের) ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী ঃ—মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ বর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব, রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য ঃ—ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য্যব্রতগ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্য্যবিভাগ ঃ—ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে "ব্রতধারী" প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

স্বামীজি স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী

ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারি হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার অণ্ডার সেক্রেটারী, এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটীও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্ব্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত 'রামকৃষ্ণ-মিশন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজি যত দিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখন উপদেশ দান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে কার্য্য ত আরম্ভ করা গেল ; এখন ত্থাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।"

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ সব বিদেশী ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এইরূপ ছিল ?

স্বামীজি। তুই কি করে জান্‌লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয় ? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখ্‌তে চাস্ ? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা পাঠ প্রবর্ত্তনা কত্তে কখনো উপদেশ দেন নাই। তিনি

সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি করে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটী নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী একথার প্রতিবাদ না করায় স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন :—"প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়ায়ে এ সব কার্য্য করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাক্‌তুম্‌, যখন কৌপীন আঁটিবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পৃথিবী ভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি! আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম্‌ করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বত্র বিজয়। এবার এদেশে কিছু কার্য্য করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর্‌, দেখ্‌বি, তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে কর্‌বে, তাই হবে। আমরা ত চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল কর্‌ছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখ্‌তে

পাচ্ছি। তবু কি জান—মধ্যে মধ্যে কেমন খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছি না ত?—তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দি।

স্বামীজি। কি জানিস্? সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন্। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনি তৈয়িরি হতে পারে। তবে তিনি তা না করে, ইচ্ছা করে, এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এইরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি কর্‌বো, বল্?

এই বলিয়া স্বামীজি কার্য্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুন্‌লি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈয়িরি হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হোতো ত ধন্য হতুম্"।

শিষ্য। মহাশয়, স্বামীজির সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ। তিনি বল্‌তেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর কখনো আসেনি'। কখনো বল্‌তেন, 'নরেন পুরুষ—তিনি প্রকৃতি'—'নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর।' কখনো বল্‌তেন, 'অখণ্ডের থাক্'। কখনো বল্‌তেন, 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী সকলও ব্রহ্ম হতে নিজের নিজের অস্তিত্ব

পৃথক্ রাখতে পারেন নাই, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি ; নরেন তাহাদেরই একজনের অংশাবতার।' কখন বল্‌তেন, 'জগৎপালক নারায়ণ, নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর ঋষির অবতার।' কখনো বলতেন, 'শুকদেবের মত, মায়া স্পর্শ করতে পারেনি!'

শিষ্য। ঐ কথা গুলি কি সত্য? না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক একরূপ বলিতেন?

যোগানন্দ। তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুতো না।

শিষ্য। তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিস্‌নি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বল্‌তেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বল্‌তেন, সব সত্য।

শিষ্য শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে স্বামীজি ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তোদের ওদেশে ঠাকুরের নাম বিশেষ-ভাবে লোকে জানে কি?'

শিষ্য। মহাশয়, একা নাগ মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে

আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার একথা ওদেশের লোকে এখনো জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

স্বামীজি। ও কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লুম, তাঁর নিজ মুখে ঐকথা বারম্বার শুন্‌লুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস কর্‌লুম্, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে নিজমুখে কখন বলিয়াছিলেন কি?

স্বামীজি। কতবার বলেছেন। আমাদের সব্বাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায়—তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে এক দিন মনে মনে ভাব্‌ছি, এই সময় যদি বল্‌তে পার, 'আমি ভগবান্', তবে বিশ্বাস কর্‌বো, তুমি সত্য সত্যই 'ভগবান্'। তখন শরীর যাবার দুই দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" আমি শুনে অবাক্ হয়ে রইলুম! প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হলো না—সন্দেহ, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—ত অপরের কথা আর কি

বল্‌বো ? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এসব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না, মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই! সংসারের ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ! এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে!

শিষ্য। মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুর বাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াছিলেন। তাই ঠাকুরে তাঁর অত বিশ্বাস হইয়াছিল।

যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না, মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হলো। দুর্য্যোধন ভেল্কীবাজী ভাব্‌লে। তিনি না বুঝালে কিছু বল্‌বার বা বুঝ্‌বার যো নাই। না দেখে, না শুনে কারও ষোল আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বারো বৎসর সাম্‌নে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্চে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাক্‌তে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য। কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজি। হাঁও বটে ; নাও বটে।

শিষ্য। কিরূপ ?

স্বামীজি। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্ এবং ধ্যান ধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান্ প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural lawর) বাইরে, কোন নিয়ম নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, "তাঁর ছেলের স্বভাব"—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না ; আবার, যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভিতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায় !—তাকে ভগবান্ অযাচিত কৃপা করে বসেন্ ! তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, একথা বল্‌তে পারিস্ ; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনো বল্‌তেন, তাঁর প্রতি নির্ভর কর্—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা ; আবার কখন বল্‌তেন, তাঁর কৃপা-বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা।

শিষ্য। মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে, এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজি। যুক্তি তর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম) এর বাইরেও বটে। প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন, আবার

সে সকলের বাহিরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে তন্মুহূর্ত্তে নিয়মের গণ্ডির বাহিরে—Beyond law—চলে যায়। সেই জন্য কৃপার কোন condition (বাঁধা ধরা নিয়ম) নাই। কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ-সৃষ্টিটাই সব তাঁর খেয়াল—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং"। যিনি খেয়াল করে এমন জগৎ গড়্‌তে ভাঙ্গ্‌তে পারেন্, তিনি কি আর কৃপা করে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন্ না? তবে যে, কারোকে সাধন ভজন করিয়ে নেন, ও কারোকে করান না—সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য। মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামীজি। বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস্, তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। তা হলেই এই জগৎভেল্কী আপনি আপনি ভেঙ্গে যাবে। তবে, লেগে থাকৃতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎ বিচার সর্ব্বদা কত্তে হবে, আমি দেহ নই—এইরূপ বিদেহ ভাবে অবস্থান কত্তে হবে, আমি সর্ব্বগ আত্মা—এইটী অনুভব কত্তে হবে। এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপ পুরুষ-কারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আস্‌বে—সেটাই হলো পঞ্চম পুরুষার্থ।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন, "তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকৃলে তোরা এখানে আস্‌বি কেন? ঠাকুর বল্‌তেন, "যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আস্‌বেই আস্‌বে,

যেখানে সেখানে থাক্ বা যাই করুক্ না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।” তোর কথাই ভেবে দেখ্‌না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ——যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক্ বুঝেছেন, সেই নাগ মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? “অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং”—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাক্‌লে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শন লাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে “তৃণাদপি সুনীচেন” তা একমাত্র নাগ মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙ্গাল দেশ ধন্য—নাগ মহাশয়ের পদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।”

বলিতে বলিতে স্বামীজি মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, “জি সি, মনে আজকাল কেবল উঠ্‌ছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দেই ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সাম্‌লে চল্‌তে হয়। কখনো ভাবি—সম্প্রদায় হোক্। আবার ভাবি—না, তিনি কারো ভাব কদাচ নষ্ট করেন নাই; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল?”

গিরিশবাবু। আমি আর কি বোল্‌বো? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে কত্তে হবে। আমি অতশত

বুঝি না। আমি দেখ্‌ছি, প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কার্য্য করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখ্‌ছি।

স্বামীজি। আমি দেখ্‌ছি, আমরা নিজের খেয়ালে কার্য্য করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে, তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, Guide করেন্—ঐটী দেখ্‌তে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠ্‌তে পার্‌লুম্ না!

গিরিশবাবু। তিনি বলেছিলেন, "সব বুঝ্‌লে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়্‌বে। কে কর্‌বে, কারেই বা করাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজির মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ বাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি, ঐরূপ কথা বেশী কহিতে কহিতে স্বামীজির সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে, যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়—তিনি যে কে এ কথা জান্‌তে পারেন্—তবে আর এক মুহূর্ত্তও তাঁর দেহ থাক্‌বে না।" তাই দেখিয়াছি, স্বামীজির সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও তিনি চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজিকে প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক্ আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজি তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের :সমৃদ্ধি, স্ত্রীপুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

দশম বল্লী।

স্থান—কলিকাতা।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজির শিষ্যকে ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করান—পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্বন্ধে স্বামীজির অদ্ভুত বিশ্বাস—বেদ মন্ত্রাবলম্বনে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা রূপ বৈদিক মতের অর্থ—বেদ, শব্দাত্মক—শব্দ পদের প্রাচীন অর্থ—নাদ হইতে শব্দের ও শব্দ হইতে স্থূল জগতের প্রকাশ সমাধি কালে প্রত্যক্ষ হয়—অবতার-পুরুষদিগের সমাধি কালে ঐ বিষয় যেরূপে প্রতিভাত হয়—স্বামীজির সহৃদয়তা—জ্ঞান ও প্রেমের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিষয়ে শিষ্যের গিরিশবাবুর সহিত কথোপকথন—গিরিশবাবুর সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের অবিরোধী—গুরুভক্তিবলে গিরিশ বাবুর সত্য সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করা—না বুঝিয়া কেবলমাত্র কাহারও অনুকরণ করিতে যাওয়া দূষণীয়—ভক্ত ও জ্ঞানী, দুই পৃথক্ ভূমি হইতে দেখিয়া বাক্য ব্যবহার করেন বলিয়া আপাত বিরুদ্ধ বোধ হয়—স্বামীজির সেবাশ্রম স্থাপনের পরামর্শ।

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজির নিকটে—ঋগ্বেদের সায়ন-ভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজি বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। Maxmuller (মোক্ষমূলর)এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে স্বামীজি সস্নেহে তাহাকে কখন কখন বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া

দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজি তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনো ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন; আবার কখনো বা প্রমাণ প্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন!

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পরে স্বামীজি Maxmullerএর (মোক্ষমূলরের) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মনে হয় কি জানিস্—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার কত্তে Maxmuller (মোক্ষমূলর) রূপে পুনরায় জন্মেছেন; আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। Maxmuller (মোক্ষমূলর) কে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে! এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশেও দেখা যায় না; তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে! বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড় বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার কচ্ছে।—আমায় বিদায় দেবার কালে বুড়োর চখে জল পড়েছিল!"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি Maxmuller (মোক্ষমূলর) হইয়া থাকেন ত পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মাইয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মাইলেন কেন?

স্বামীজি। অজ্ঞানে থেকেই মানুষ 'আমি আর্য্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার,

জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম জাতিবিভাগ কি? —তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য! জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিস্ নি?—East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয় নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসহরা দিয়ে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখনো দেখেছে? Maxmuller (মোক্ষমূলর) নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (হস্তলিপি) লিখেছেন; তার পর ছাপ্‌তে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য্য নয়। ইহাতেই বোঝ্; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

মোক্ষমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার, বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে সায়নের এই মত, স্বামীজি সর্ব্বথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বেদ মানে—অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন, আমাদের মত সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা;

পৈঁতা গলায় ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ, শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যাহা পরে স্থূলাকার গ্রহণ কোরে আপনাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমেই মীনাবতারে—বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার সাধন হলো। তার পর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগ্‌লো। অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈয়িরি হতে লাগলো। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও এইরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ পৃথিবীং দিবঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ"। বুঝ্‌লি ?"

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশ্যে শব্দ প্রযুক্ত হইবে ? আর পদার্থের নাম সকলই বা কি করিয়া তৈয়ারি হইবে ?

স্বামীজি। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ্‌; এই ঘটটা ভেঙ্গে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি ? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটা হচ্ছে ঐ সকল জিনিসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায়

অবস্থিত পদার্থ সকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থ সকলের সূক্ষ্ম স্বরূপ সমূহ ব্রহ্মে কারণ-রূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপ সমূহের সমষ্টিভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে উঠে ও উহারই প্রকৃতিস্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ ওঁকার আপনা আপনি উঠিতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটী বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজি। জগতে যত ঘট আছে, সব গুলো নষ্ট হলেও ঘটশব্দ থাকৃতে যে পারে, তাত বুঝেছিস্? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও, বা যে সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সে গুলো সব ভেঙ্গে চুরে গেলেও তত্তৎ বোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই ত ঘট তৈয়িরি হয় না।

স্বামীজি। তুই, আমি, ঐরূপে চীৎকার কর্‌লে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন ঘটন হতে পারে—

তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাকালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন; পরে ওঁকারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তার পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, বা গো, মানব, ঘট, পট ইত্যাদি ঐ ওঁকার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা করে হবা মাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শব্দই কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য হাঁ, এক প্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজি। ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে, শেষে নির্ব্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তার পর গভীর ওঁকার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।—তার পর তাও শুনা যায় না।—তাও আছে কি নাই এইরূপ বোধ হয়! ঐটেই হচ্চে অনাদি নাদ। তার পর প্রত্যক্ ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্—সব চুপ।

স্বামীজির কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজি ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন। নতুবা এমন বিশদভাবে এ

সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা শুনা জিনিস না হইলে কখন কেহ এরূপে বলিতে বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—"অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেবে আসেন তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন, ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হইয়া ওঁকারের অনুভব করেন, ওঁকার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তার পর সর্ব্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে, পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নাম্‌তে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়। "ক্ষীরে নীরবৎ।"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজির ঐরূপে অপূর্ব্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়'* এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচার গুলি

* ন্যায় প্রস্থানের গ্রন্থবিশেষ।

খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে ; কিন্তু Terminologyর (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে উঠে !"

এইবার গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজি বলিলেন—"কি, জি সি, এসব ত কিছু পড়্‌লে না, কেবল কেষ্ট বিষ্ণু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশবাবু। "কি আর পড়বো ভাই ? অত অবসরও নাই, বুদ্ধিও নাই যে, ওতে সেঁধুবো। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও সব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মার্‌বো। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েচেন, আমার ওসব দরকার নাই," বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থ খানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়!'

পাঠককে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, স্বামীজি যখন যে বিষয়ে উপদেশ করিতেন, শ্রোতাদিগের মনে তদ্বিষয় তখন এত গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে, ঐ বিষয়কেই তাহারা ঐ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সার বস্তু বলিয়া অনুভব করিত। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যখন তিনি বলিতে থাকিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ তল্লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করিত। আবার, ভক্তি বা কর্ম্ম বা জাতীয় উন্নতি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যখন তিনি প্রসঙ্গ উঠাইতেন, তখন তত্তদ্বিষয়কেই শ্রোতারা মনে মনে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিয়া তত্তদ্বিষয়ানুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। বর্ত্তমানে, বেদের প্রসঙ্গ উঠাইয়া তিনি শিষ্য প্রভৃতির মন বেদোক্ত জ্ঞানের মহিমায় এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তখন

উহাপেক্ষা সার এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অন্য কিছুই আর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গিরিশ বাবু তদ্বিষয় লক্ষ্য করিলেন; এবং স্বামীজির মহদুদার ভাব শিক্ষাদানের ঐরূপ রীতির বিষয় ইতি-পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত থাকায় শিষ্য প্রভৃতিকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাইয়া দিবার জন্য এখন মনে মনে এক যুক্তি স্থির করিলেন।

স্বামীজি অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতিমধ্যে গিরিশ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হাঁহে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা মহাপাতকাদি চোখের সাম্‌নে দিন-রাত ঘুর্‌চে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নি, এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশ খানি পাতা পড়তো সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জুয়োচুরী করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করিবার কোনও উপায় তোমার বেদে আছে কি?" গিরিশ বাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজি নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগতের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজির চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি বাঙ্গাল, কতবড় প্রাণ! তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লি ত, মানুষের দুঃখ কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজির বেদ বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাই ভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজির মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু। জগতে এই দুঃখ কষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়্‌ছেন! রেখে দে তোর বেদ বেদান্ত।

শিষ্য। আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন; নিজে হৃদয়বান্ কি না? কিন্তু এই সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দ্যাখ্ না, তোর গুরু (স্বামীজি) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বল্‌ছে না "সৎ-চিৎ-আনন্দ" তিনটে একই জিনিস? এই দ্যাখ্ না? স্বামীজি অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর্‌ছিলেন, কিন্তু যাই

জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন ত অমন বেদ আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যই ত গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবিকই বেদের অবিরোধী।"

ইতিমধ্যে স্বামীজি আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?" শিষ্য বলিল—"এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত গুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

স্বামীজি। গুরুভক্তি থাক্‌লে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়্‌বার শুন্‌বার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্ল্লভ। ওঁর (গিরিশবাবুর) মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়্‌বার দরকার নাই। কিন্তু ওঁকে (গিরিশ বাবুকে) imitate (অনুকরণ) কত্তে গেলে অপরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। ওঁর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওঁর দেখাদেখি কাজ কর্‌তে যাবি না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। আজ্ঞে হাঁ নয়! যা বলি সে সব কথাগুলি বুঝে নিবি—মূর্খের মত সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবিনি। আমি বল্‌লেও—বিশ্বাস কর্‌বিনি। বুঝে, তবে নিবি। আমাকে

ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্ব্বদা বল্‌তেন। সদ্‌-যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চল্‌বি। বিচার কত্তে কত্তে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রকাশিত) হবেন। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও সব পড়ে?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার কত্তে, এখন করি কি?

স্বামীজি। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই stand-point (বিপরীত দিক্) থেকে আমাদের দুজনের কথা-গুলি বলা হচ্ছে—এই পর্য্যন্ত। একটা অবস্থা আছে যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায়—"মূকাস্বাদনবৎ।" আর একটা অবস্থা আছে যাতে—বেদাদি শাস্ত্র গ্রন্থের আলোচনা—পঠন পাঠনা কত্তে কত্তে সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এ সকল পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে—বুঝ্‌লি?

নির্ব্বোধ শিষ্য স্বামীজির ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"মহাশয়, শুনিলেন ত, স্বামীজি আমায় বেদ বেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।"

গিরিশবাবু। তা তুই করে যা। স্বামীজির আশীর্ব্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"ওরে, এই জি সির মুখে দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু কচ্ছে। দেশের জন্য কিছু কত্তে পারিস্?

সদানন্দ। মহারাজ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজি। প্রথমে ছোট খাট scaleএ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল্, যাতে গরীব দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে—যাদের কেউ দেখ্‌বার নাই, এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবা করা হবে—বুঝ্‌লি?

সদানন্দ। যো হুকুম মহারাজ!

স্বামীজি। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবাধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান কর্‌তে পার্‌লে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—"মুক্তিঃ করফলায়তে।"

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজি বলিলেন—"দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর কর্ত্তে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো! তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয়, ত তা কোরবো। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে?"

গিরিশবাবু। তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বল্‌তেন!

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্য্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

একাদশ বল্লী।

স্থান—আলমবাজার মঠ।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—মঠে স্বামীজির নিকট হইতে কয়েকজনের সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ—সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজির উপদেশ—ত্যাগই মানব জীবনের উদ্দেশ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগই সন্ন্যাস—সন্ন্যাস গ্রহণের কালাকাল নাই, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—চারি প্রকারের সন্ন্যাস—ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর হইতেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের বৃদ্ধি—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রম থাকিলেও ত্যাগ বৈরাগ্যই মানব জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতনা—নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসিদল দেশের কোন কাজে আসে না, ইত্যাদি যুক্তি খণ্ডন—যথার্থ সন্ন্যাসী নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত শেষে উপেক্ষা করিয়া জগতের কল্যাণ-সাধন করেন।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক স্বামীজির নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময়ে স্বামীজি অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিষয় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষও জগতের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; তাহাই কেবল নহে,—বহুজনহিতকর, বহুজনসুখকর কোন

ঐহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্ব্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকগণের সমক্ষে স্থাপন করিতেন; এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহিত করিতেন ও কৃপা করিতেন। তাঁহার উৎসাহবাক্যে তখন কতিপয় ভাগ্যবান্ যুবক সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যে চারিজনকে স্বামীজি প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাঁহাদের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল। শিষ্যের মনে সেই দিন এখনও জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে ইদানীং যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারাই ঐ দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মঠের সন্ন্যাসিগণের মুখে শিষ্য অনেকবার শুনিয়াছে যে, ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধার সাধনে পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে কে আর দেখ্‌বে—তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।" স্বামীজির বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজি নিজ কৃপাগুণে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুদিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে

বলিলেন, "তুই ত ভট্‌চায্‌ বামুন; আগামী কল্য তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি; পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি পুঁথি সব পড়ে শুনে দেখে নিস্।" শিষ্য স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বদিন সন্ন্যাস ব্রত ধারণে কৃতনিশ্চয় উক্ত ব্রহ্মচারি চতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, গঙ্গা স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং স্বামীজির স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন।

এখানে ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে না যে, শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়, কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। পুত্র পৌত্রাদি কৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া, সংসারের, এমন কি, নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্প দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ সাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিবাস ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। শিষ্য দেখিয়াছে, স্বামীজি এই সকল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্রমতে ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহা বিরক্ত হইতেন। আজ কাল যেমন গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেই অনেকে সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন, স্বামীজি সেরূপ মনে

করিতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমান কাল প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা-সাধনোপযোগী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের প্রাগনুষ্ঠেয় নৈষ্ঠিক সংস্কারগুলি ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন। আমরা একথাও শুনিয়াছি যে, পরমহংসদেবের অপ্রকট হইবার পর স্বামীজি সন্ন্যাস লইবার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যে সকল উপনিষদাদি শাস্ত্রে আছে, সে সকল আনাইয়া স্বীয় গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গে একত্রে ঠাকুরের ছবির সমক্ষে বৈদিক মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলমবাজার মঠে উপর তলায় যে জলের ঘর ছিল, তাহাতে শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্য সম্ভার আনীত হইয়াছে। স্বামী নিত্যানন্দ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধক্রিয়া অনেক বার করিয়াছিলেন; সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাড়ের কোন ত্রুটি হয় নাই। শিষ্য স্নানান্তে স্বামীজির আদেশে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রাদির যথাযথ পঠন পাঠন হইতে লাগিল। স্বামীজি এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন! শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড নিজ নিজ পদে অর্পণ করিয়া আজ হইতে সংসার-সমক্ষে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন, শিষ্য তখন নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইল; সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইল। পিণ্ডাদি লইয়া যখন ইঁহারা গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজি শিষ্যের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?" শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—

এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে। 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'।"

স্বামীজির কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল,—শাস্ত্র জ্ঞানাস্ফালন দূরীভূত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, কার্য্যে ও কথায় এত প্রভেদ!

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতিমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য, তোমাদের গর্ভধারিণী। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজি কেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম বিষয়েই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করবো, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদবেই নিবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে—এতটুকু কামনা যার রয়েছে—এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, 'একুল ওকুল দুকুল রেখে চলতে হবে'। ও সব পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ—অশাস্ত্রীয়—অবৈ-

দিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" গীতাতেও আছে—"ক্যামানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"।—

সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কাহারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে, সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাক্‌বে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয়—অর্থের দাস—নয়—মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়্‌লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়! যে যতই কেন বলুক্ না, আমি বুঝেছি, এ সব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে সন্ন্যাস গ্রহণ না কর্‌লে—কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধি লাভ হয়?

স্বামীজি। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে পড়্‌তে পার্‌ছিস্—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়্‌তে পার্‌ছিস্—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য। মহাশয় সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজি। সন্ন্যাসধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বল্‌ছেন, "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ" যখনি বৈরাগ্যের

উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা কর্‌বে। যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।

কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥"

জীবনের অনিত্যতা বশতঃ যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখ্‌তে পাওয়া যায়। (১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবদিষা সন্ন্যাস, (৩) মর্কট সন্ন্যাস, এবং (৪) আতুর সন্ন্যাস হঠাৎ ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হলো ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো—এটী প্রাগ্‌জন্মসংস্কার না থাক্‌লে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জান্‌বার প্রবল বাসনা থেকে—শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন কত্তে লাগ্‌লো—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়নায় স্বজন বিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম মর্কট সন্ন্যাস। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, "বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকুরী বাগিয়ে নিলে; তার পর চাই কি পরিবার আন্‌লে বা আবার বে করে ফেল্লে।" আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে—যেমন—মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচিবার আশা নাই। তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে ত পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল। পর

জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর, যদি বেঁচে যায় ত আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হ্য়ে কালযাপন কর্‌বে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী আতুর সন্ন্যাস দিয়েছিল! সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাস গ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই।

শিষ্য। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায় ?

স্বামীজি। সুকৃতি বশতঃ কোন না কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু একটা Exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম্ম পালন করেও দু একটা মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায় ; যেমন আমাদের মধ্যে নাগ মহাশয়।

শিষ্য। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্বামীজি। পাগলের মত কি বল্‌ছিস্। বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্ জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস—ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগ ব্রত বিশেষ রূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়-বিতৃষ্ণাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ত্যাগ বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম্ম

absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায় নি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেবের জন্মাইবার পূর্ব্বে দেশে ত্যাগ বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজি। তা কে বল্‌লে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য বলিয়া সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্য-দার্ঢ্য ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়েও শান্তি পেলেন না। তার পর "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন্ এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠ্‌লেন। ভারতবর্ষে এই যে সব সন্ন্যাসীদের মঠ ফঠ দেখতে পাচ্ছিস্—এ সব বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙ্গে রঙ্গিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান্ বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালাস্থিতে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।" উত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "মন্বাদি সংহিতা, পুরাণ সকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান্ বুদ্ধ তার ঢের আগে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে, বৌদ্ধধর্ম্মের

সমালোচনা নিশ্চয় থাকৃতো; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা দেখা যায় না—তখন তুমি কি করে বল্‌বে, বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দুই চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে—তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।”

স্বামীজি। History (ইতিহাস) পড়ে দেখ্‌। দেখ্‌তে পাবি, হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতির জীবনে ঠিক্ ঠিক্ অনুষ্ঠান কোরে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজি। ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। Historyকে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মান্‌লে কিন্তু একথা স্বীকার কর্‌তে হয় যে, পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান্ বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান কর্‌ছেন।

এইবার পুনরায় সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজি বলিলেন, “সন্ন্যাসের Origin (উৎপত্তি) যেখানেই হোক না কেন, মানব-জন্মের Goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে, এই ত্যাগব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। যাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ে সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য। মহাশয়, আজ কাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান্ বলিয়া ইঁহারা বলেন, "উঁহারা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়কারী হন না।"

স্বামীজি। লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানেটা কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি।

শিষ্য। পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যা সহায়ে, দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞান সহায়ে দেশে বাণিজ্য, শিল্প, পোষাক পরিচ্ছদ, রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজি। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এসব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখ্‌লুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নাই! কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতর সাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভিতরেই দেখেছি, রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড। যথার্থ সন্ন্যাসী, গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্ব্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান প্রদান না থাক্‌লে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Indians-দের (আদিমনিবাসীদের) মত extinct (উজাড়) হয়ে যেত।

সন্ন্যাসীদের গৃহীরা দুমুটো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্ম্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্ম্মের fountain head (উৎস)। উচ্চ আদর্শ সকল তাদের জীবনে বা কার্য্যে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সকল ideas (উচ্চ ভাব সকল) নিয়েই গৃহীরা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাব সকল জীবনে পরিণত কর্‌ছে ও ঠিক ঠিক কর্ম্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত কর্‌ছে, তার বিনিময়ে তারা তাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাও আবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের স্নেহাশীর্ব্বাদেই দেশের লোকের বর্দ্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institutionএর (পদ্ধতির) নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসার-সাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুব্‌ছে না।

শিষ্য। মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়?

স্বামীজি। হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন ত ভরপুর। তিনি যে সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর

পর অবধি লোকে নিয়ে চল্‌বে। এই সন্ন্যাস institution (পদ্ধতি) দেশে ছিল বলেই ত তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরা দেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে—তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত যে, এই আশ্রম সকলাশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার কারণ কি?—যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল কত্তেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হোস্ ত তোদের ধিক্—শত ধিক্।

বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরব প্রসঙ্গে স্বামীজি যেন মূর্ত্তিমান্‌সন্ন্যাসরূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতেই যেন অন্তর্ম্মুখী হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে—

জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ কত্তে, বিধবার অশ্রু মুছাইতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান কত্তে অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী কত্তে—শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত কত্তে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।” পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ আমাদের জন্ম। কি কচ্চিস্ সব বসে বসে ? ওঠ্—জাগ্—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—‘উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”।

দ্বাদশ বল্লী।

স্থান—কলিকাতা—বলরাম বাবুর বাটী।

বর্ষ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—গুরুগোবিন্দ শিষ্যদিগকে কিরূপ দীক্ষা দিতেন—তিনি পঞ্জাবের সর্ব্বসাধারণের মনে তৎকালে একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন—সিদ্ধাই-এর অপকারিতা—স্বামীজির জীবনে পরিদৃষ্ট দুইটী অদ্ভুত ঘটনা—শিষ্যের প্রতি উপদেশ,—"ভূত ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভূত হয়, এবং সদা সর্ব্বদা 'আমি নিত্য মুক্ত বুদ্ধ আত্মা' এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ব্রহ্মজ্ঞ হয়।"

স্বামীজি আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা, প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামীজি ঐ বাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজির খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজি গুরু-গোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখ্‌জাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতপূর্ব্ব ব্যক্তিগণকে পর্য্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখ্‌জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্ম্মদাতীরে মানব-লীলা সংবরণ করেন—ওজস্বিনী ভাষায় তত্তদ্বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা

করিতে লাগিলেন। গুরু গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজি শিখ্‌জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

"সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ নাম স্থনাউঁ॥"

অর্থাৎ—গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিয়া এক এক জন ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি সঞ্চারিত হইত! অর্থাৎ, তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া গুরু-গোবিন্দের প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত! ধর্ম্মমহিমাস্থচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজির উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজির মুখপানে চাহিয়া—উহাই দেখিতে লাগিল! কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজির ভিতরে ছিল। যখন যে বিষয়ের কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত, ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয়াপেক্ষা বড় এবং তল্লাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন!

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, "মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।”

স্বামীজি। interest common না হলে (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করিলে) লোক কখনো একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেক্‌চার করে সর্ব্বসাধারণকে কখনো unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেন নাই, কেবল উহা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।

অনন্তর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজি সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নাবিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলেই সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিল।

স্বামীজি বলিলেন, “সিদ্ধাই বা বিভূতি শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমনেই লাভ করা যায়।” শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, তুই thought reading (অপরের মনের কথা ঠিক্ ঠিক্

পাঠ করিতে) শিখ্‌বি? চার পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখাইয়া দিতে পারি।

শিষ্য। তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজি। কেন? পরের মনের ভাব জান্‌তে পার্‌বি।

শিষ্য। তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভে কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজি। কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য। তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বা দেখিয়াছেন, তাহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজি। আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ কত্তে কত্তে কোনও পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলুম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুন্‌তে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলুম—গ্রামের কোনও লোকের উপর 'দেবতার ভর' হইয়াছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয়ে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ কত্তে ব্যাপারখানা দেখ্‌তে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহুলোকের সমাবেশ। লম্বা, ঝাঁক্‌ড়া-চুলো একটা পাহাড়ীকে দেখাইয়া বলিল, ইহারই উপর 'দেবতার ভর' হইয়াছে। দেখ্‌লুম, তাহার নিকটেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াইতে দেওয়া হইয়াছে। খানিক বাদে দেখি, ঐ অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতা-বিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগাইয়া ছ্যাঁকা দেওয়া

হইতেছে, চুলেও লাগান হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তাহার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হইতেছে না, বা তাহার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে না! দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করযোড়ে আমার কাছে এসে বল্লে,—"মহা-রাজ—আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়াইয়া দিন্।" আমি ত ভেবে অস্থির! কি করি—সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হলো। গিয়েই কিন্তু অগ্রে কুঠারখানা পরীক্ষা কত্তে ইচ্ছা হলো। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় ত অস্থির। থিওরী মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেলো। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ কল্লুম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেলো। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট বিষ্ণু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝ্তে পার্লুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাহার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়্লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, আর, এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্যভেদ কত্তে পাল্লুম না বলে চিন্তায় ঘুম হলো না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ

হলো না দেখে কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো, "there are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy"—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার, দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও সন্ধান পায় না।

শিষ্য। পরে ঐ বিষয়ের কোনও সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজি। না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটী মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বল্লুম।

অনন্তর স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই সকলের বড় নিন্দা কত্তেন। বল্‌তেন, 'ঐ সকল শক্তি প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছান যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্ব্বল মন, গৃহস্থের ত কথাই নাই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকী দেখ্‌লে লোকে অবাক্ হয়ে যায়। সিদ্ধাই লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্ম্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝ্‌তে পেরেছি। সে জন্য দেখিসনি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেহই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?"

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজিকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুড়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা 'বাঙ্গাল্'কে বল না।"

শিষ্য ঐ বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনে নাই। সুতরাং ঐ কথা বলিবার

জন্য স্বামীজিকে জেদ্ করিয়া ধরিয়া বসিল! স্বামীজি অগত্যা ঐ কথা তাহাকে এইরূপে বলিলেন—

মান্দ্রাজে যখন মন্মথ বাবুর* বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখ্লুম, মা (স্বামীজির গর্ভধারিণী) মরে গেছেন। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম্ না—তা বাড়ীতে লেখা ত দূরের কথা। মন্মথকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনি ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় তার করিলেন। কারণ, স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো; আবার, এ দিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমায় আমেরিকা যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মার শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথ বল্লেন যে, সহরের কিছু দূরে এক জন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে—সে জীবের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যৎ, সকল খবর বলে দিতে পারে। মন্মথর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর কত্তে তাহার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথ বাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে করে গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে সেখানে ত গেলুম। গিয়ে দেখি, শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁট্কো, ভূষ্কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' করে মান্দ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, উনিই পিশাচ-সিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা আমাদের সে ত আমলেই আন্লে না।

* ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

তার পর যখন আমরা ফের্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ কর্‌লে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ কর্‌ছিল, আমাদের দাঁড়াবার কথা বল্‌লে। তার পর একটা পেন্‌সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক্ পাড়্‌তে লাগ্‌লো। পরে দেখ্‌লুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়্‌লো। তার পর আগে আমার নাম গোত্র চৌদ্দ পুরুষের খবর বল্লে; আর বল্লে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফির্‌ছেন, এবং গর্ভধারিণী মার মঙ্গল সমাচারও বল্লে। আর, ধর্ম্মপ্রচার কত্তে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে। এইরূপে মার মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্য্যের (মন্মথনাথ) সঙ্গে সহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মার মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিলেন—"বেটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেলো; তা সেটা 'কাক-তালীয়ে'র ন্যায়ই হোক, বা যাই হোক্!"

স্বামী যোগানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এ সব কিছু বিশ্বাস কত্তে না, তাই তোমার ঐ সকল দেখ্‌বার প্রয়োজন হয়েছিলো।"

স্বামীজি। আমি কি না দেখে না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ ভেল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেল্‌কীই না দেখ্‌লুম! মায়া—মায়া!!! রাম রাম! আজ কি ছাই ভস্ম কথাই সব হলো।

ভূত ভাব্‌তে ভাব্‌তে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর, যে দিন রাত্‌ জান্‌তে অজান্‌তে বলে—'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজি স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ঐ সব ছাই ভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার কর্‌বি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে প্রাণপণে যত্ন কর্‌বি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আর সবই মায়া—ভেল্‌কীবাজী। এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'

কথা হইতে হইতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজি আহারান্তে বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। শিষ্য স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজি বলিলেন—"কাল আস্‌বি ত ?"

শিষ্য। আজ্ঞে আসিব বৈ কি ? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে।

স্বামীজি। তবে এখন আয়। রাত্রি হয়েছে।

অনন্তর শিষ্য স্বামীজির কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ১২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়—ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা—স্বামীজির ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ভক্তগণকে যজ্ঞোপবীত-প্রদান—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের মঠে সমাদর—কর্ম্মযোগ বা পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মদর্শন অবশ্যম্ভাবী—বিস্তৃত যুক্তির সহিত স্বামীজির ঐ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া।

স্বামীজি যে বৎসর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসেন, সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়। কিন্তু নানা কারণে পর বৎসর দক্ষিণেশ্বরে উৎসব বন্ধ হয়, এবং বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হয়। উহার কিছুদিন পরে বর্ত্তমান মঠের জমি খরিদ হইয়াছিল, তথাপি সে বৎসর জন্মোৎসব নূতন জমিতে হইতে পায় নাই। কারণ, তখনও মঠের জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, এবং অনেক স্থলে সমতল ছিল না। তাই সেবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বেলুড়ে দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে হয়। ঐ উৎসবের অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী ফাল্গুনী দ্বিতীয়া তিথিতে, নীলাম্বর বাবুর বাগানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা হয়, এবং এই জন্মতিথিপূজার দুই এক দিন পরেই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ইত্যাদি মঠের জন্য ক্রীত

জমিতে লইয়া যাইয়া পূজা হোমাদি করিয়া তথায় ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বামীজি তখন পূর্ব্বোক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল আয়োজন। স্বামীজির আদেশমত ঠাকুর-ঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজি সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

জন্মতিথির সুপ্রভাতে সকলেই আনন্দিত। কেবল ঠাকুরের কথা ছাড়া ভক্তদের মুখে আর কোনও কথা নাই। পূজার ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া স্বামীজি এইবার পূজার আয়োজন দর্শন করিতে লাগিলেন।

পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "পৈতা এনেছিস্ ত ?"

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশ মত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজি। দ্বিজাতিমাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আস্‌বে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দিব। এরা সব ব্রাত্য (পতিতসংস্কার) হয়ে গেছে। শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করে এনেছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে উহা পরাইয়া দিব।

স্বামীজি। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি-দ্বিজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দু মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। ছোঁব না ছোঁব না বলে ইহা-দিগকে আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুল্‌তে হবে—অভয়বাণী শুনাতে হবে। বল্‌তে হবে—'তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে,' বুঝ্‌লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আস্‌তে বল্‌। তার পর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পর্‌বে।

স্বামীজির আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করে এসে, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে পৈতে পরিতে লাগিল। মঠে হুলুস্থূল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাদের দেখে স্বামীজির মুখারবিন্দ যেন শত গুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষজা মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজির আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজিকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ সকল পরিয়া স্বামীজির রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজিও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজির চারি দিকে মূর্ত্তিমান্ ভৈরব-গণের ন্যায় অবস্থান করিয়া, মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা-বিস্তার করিলেন। সে দৃশ্য স্মরণ করিয়াও এখন আনন্দ হয়!

এইবার স্বামীজি পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" স্তবটী মধুর মধুর উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল "রাম রাম শ্রীরাম রাম" এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামীজির অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোনও কথা নাই। স্বামীজির কণ্ঠ-নিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামীজি শিবভাবে মাতোয়ারা হইয়া রাম নাম করিতেছেন! স্বামীজির মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাত-সূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে; অনুভূতির বিষয়। "দর্শকগণ চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে!"

রামনামকীর্ত্তনান্তে স্বামীজি পূর্ব্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামীজির যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর সারদানন্দ স্বামীকে গায়িতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ "এক রূপ অরূপ নাম বরণ" গানটী গাইলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল গান গায়িতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজি সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশ বাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজি বলিলেন, "পরমহংস-

দেব বলিতেন, "ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদিগের সহিত ইঁহার কোনও প্রভেদ নাই।" গিরিশ বাবু নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজির আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশ বাবুকে পরান হইল। গিরিশ বাবু কোনও আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজি বলিলেন—"জি. সি. * তুমি আজ আমাদিগকে ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শুনাইবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বোস্।" গিরিশ বাবুর তখনও মুখে কোনও কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা-দর্শনে ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ-দর্শনে তিনিও আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশ বাবু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? তবে কামকাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি।" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বামীজি কয়েকটী হিন্দী গান গাহিলেন। "বৈঁইয়া

* গিরিশবাবুকে স্বামীজি 'জি. সি.' বলিয়া ডাকিতেন।

না পাকাড়ো মেরা নরম কহলাইয়াঁ।” ইত্যাদি। শিষ্য সঙ্গীত-বিদ্যায় একেবারে পণ্ডিত, তাই ঐ সকল গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না; কেবল স্বামীজির মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজি নীচের বৈঠকখানার ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজি বলিলেন—“তোরা হচ্ছিস্ দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গিছ্‌লি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ এক শত বার জপ্‌বি, বুঝ্‌লি?” গৃহস্থটী “যে আজ্ঞে” বলিয়া স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নানা সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজি বারংবার বসিতে বলায় জড়সড় ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজি। মাষ্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শুনাতে হবে।

মাষ্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনত মস্তকে রহিলেন। ইতিমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটী পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পান্তুয়া দুইটী দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজি প্রভৃতিকে

উহা দেখান হইলে পর স্বামীজি বলিলেন—"ঠাকুর ঘরে নিয়ে যা।"

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—"দেখ্‌ছিস্‌ কেমন কর্ম্মবীর! ভয়, মৃত্যু—এ সবের জ্ঞান নাই;—এক রোকে কর্ম্ম করে যাচ্ছে—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।'

শিষ্য। মহাশয়, কত তপস্যার বলে উঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

স্বামীজি। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার, পরার্থে কর্ম্ম কর্‌লেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্ম-যোগীরা কর্ম্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা কর্‌তে কর্‌তে যেমন পর-হিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কায কর্‌তে কর্‌তে পরাতপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়ে পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজি। তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান্‌লাভে আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্ম্মও সেইরূপ। সুতরাং যারা পরহিতে কার্য্য করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বল্‌বার অধিকার নাই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে

যা ; আর এক জনের কর্ম্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ কর্‌বার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস্—কর্ম্মটা আর তপস্যা নয়!

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, পূর্ব্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজি। যেমন সাধন ভজন অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে তাতে একটা রোক্ জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কায কর্‌তে কর্‌তে হৃদয় ক্রমে তাইতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝ্‌লি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ্ না, তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থ কর্ম্মের ফলে মনের আঁক বাঁক ভেঙ্গে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পর-হিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজি। নিজ-হিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস্, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাব্‌তে গেলে, এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাব্‌না ভাব্‌বি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এইরূপ কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আস্‌বে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্ব জীবে, সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখ্‌তে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও, জান্‌বি, এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। ইহার উদ্দেশ্যও

হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিন রাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে?

স্বামীজি আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার, সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে, ঐ কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস ত আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেয়ালটা বা কাঠখানার মত—হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য। তাহা না হইলেও সর্ব্ব বৃত্তি ও কর্ম্মের নিরোধকেই ত শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজি। শাস্ত্রে যাকে সমাধি বলা হয়েছে, সে অবস্থা ত আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কাহারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাক্‌বে বল্? সে জন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থা-লাভের পর সাধক ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে, প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্তি অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য। তবেই ত এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয়, যে, জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কায করা যায় না।

স্বামীজি। শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার বলেছে যে, পরার্থে

সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্ম্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ কর্‌বার শাস্ত্রের কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজিও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন—

দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরি অবনী এসেছ কি সকাতরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥*

গিরিশ বাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। "তাপিতা হেরি অবনী এসেছ কি সকাতরে"—পদটী বার বার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর "মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ নীলকমলে", "অগণন ভুবনভারধারী" ইত্যাদি কয়েকটী গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটী জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তৎপরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধূম পড়িয়া গেল।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত।

চতুর্দ্দশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়—ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—নূতন মঠের জমীতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যশঙ্করের অনুদারতা—বৌদ্ধধর্ম্মের পতন-কারণ-নির্দ্দেশ—তীর্থমাহাত্ম্য—'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা' শ্লোকার্থ—ভাবাভাবের অতীত ঈশ্বর স্বরূপের উপাসনা।

আজ নূতন মঠের জমীতে স্বামীজি যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া, স্বামীজি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল বিল্ব-পত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন, এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব্ব দর্শন! তাঁহার ধর্ম্ম-প্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর-ঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি, স্বামীজি স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া, অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য

সন্ন্যাসিগণ সহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খঘণ্টা-রোলে তট-ভূমি মুখরিতা হওয়ায়, ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাক্‌ব। তা গাছ-তলাই কি, আর কুটীরই কি।' সে জন্যই আজ আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে, নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জান্‌বি, বহু-কাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাক্‌বেন।"

শিষ্য। ঠাকুর আপনাকে কখন্ এ কথা বলিয়াছিলেন ?

স্বামীজি। (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিস্ নি ?—কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য। ওঃ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল ?

স্বামীজি। হাঁ, 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কসাকসি হয়েছিল। জান্‌বি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক্ ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গেরস্থই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক—তাদের ভিতর দল ফল নাই, থাক্‌তেই পারে না। তবে ওরূপ একটু আধটু মন-কসাকসির কারণ কি, তা জানিস ? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙ্গে রঙ্গিয়ে, এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য্য, আর, আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙ্গিন কাঁচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্য্যকে নানা-রঙ্গ-

বিশিষ্ট বলে দেখ্‌ছি। অবশ্য, এ কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতার পুরুষের সাক্ষাৎসম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎ-কালে ঐরূপ দল ফল সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোক ঝল্‌সে যায়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি, সব ভেসে যায়। কাজেই 'দল, ফল' কর্‌বার তাদের অবসর হয় না। কেবল যে যার নিজের ভাবে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেও, সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন ও সে জন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায় সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজি। হাঁ; এ জন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই ত্যাখ্‌না, চৈতন্যদেবের এখন দু তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ই চৈতন্য-দেব ও যীশুকেই মান্‌ছে।

শিষ্য। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে, বোধ হয়, বহু সম্প্রদায় দাঁড়াইবে।

স্বামীজি। হবে বই কি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাক্‌বে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটী ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান

হবে। এখান থেকে যে মহা সমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি স্কন্ধস্থিত কৌটাটী জমীতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজি পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন, এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে, স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া, ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটী গৃহস্থকে দীক্ষা-প্রদানও করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূজা-সমাপন করিয়া স্বামীজি সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করিয়া রাখেন।" সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজি শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরের এই কৌটা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কাহারও আর অধিকার নাই; কারণ, আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসাইয়াছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) নিয়ে চল্।" শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—"ভয়

নাই, কর্, আমার আজ্ঞা।” শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল, এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজি, তার পর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজি তাহাকে বলিলেন—‘ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠিয়া তোকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সাবধান, আজ হতে আর কোনও অনিত্য বিষয়ে মন দিস্‌নে।’ একটী ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্ব্বে স্বামীজি শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন—‘দেখিস্, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।’

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি শিষ্যকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন— “ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা, আমার মাথা থেকে নাম্‌লো। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস্? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারিদিক্‌কার জমীতে ঘরবাড়ী করে থাক্‌বে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাক্‌বে। আর, মঠের ঐ দক্ষিণের জমীটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাক্‌বার ঘর দোর হবে। এরূপ হলে কেমন হয় বল্ দেখি?”

শিষ্য। মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।

স্বামীজি। কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি ত পত্তনমাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক

করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা idea (মতলব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব work out (কাজে পরিণত) কর্‌বি। বড় বড় principle (মীমাংসা) কেবল শুন্‌লে কি হবে? সেগুলিকে practical fieldএ দাঁড় করাতে—প্রতি-নিয়ত কাজে লাগাতে—হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়্‌লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝ্‌তে হবে। তার পর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝ্‌লি? একেই বলে practical religion (কর্ম্মজীবনে পরিণত ধর্ম্ম)।

এইরূপ নানাপ্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতকে সে সর্ব্ব দর্শনের মুকুটমণি বলিয়া জ্ঞান করিত, এবং শ্রীশঙ্করের কোনও কথায় কেহ কোনরূপ দোষার্পণ করিলে, তাহার হৃদয় যেন সর্পদষ্ট হইত। স্বামীজি উহা জানিতেন, এবং কেহ কোনও মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতেন, এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজি। শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি;—বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয়। আবার, ব্রাহ্মণ অভিমানটুকু খুব ছিল। একটী দক্ষিণী ভট্‌চায্যি গোছের ছিলেন আর কি।

ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্ত-ভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্ব্বজন্মের ব্রাহ্মণ-শরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজ কাল যদি ঐরূপ কোনও শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বল্‌তে হবে যে, সে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কি রে বাবা? বেদ তো ত্রৈবর্ণিকমাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই অদ্ভুত বিদ্যা-প্রকাশের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে, কত বৌদ্ধ শ্রমণককে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌লেন—তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মুক বৌদ্ধগুলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মর্ত্তে গেলো! শঙ্করের ঐরূপ কার্য্যকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীর উত্তেজনাপ্রসূত পাগলামী) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু ছাখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবন দান কর্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া!

শিষ্য। বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামী বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কি না নিজের গলা দিতে গেলেন!

স্বামীজি। কিন্তু তাঁর ঐ fanaticismএ জগতের জীবের কত কল্যাণ হলো—তা দেখ্; কত আশ্রম স্কুল, কত কলেজ, কত public hospital, (সাধারণ জন্য হাঁসপাতাল) কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হোলো, তা ভেবে দেখ্। বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব—তাও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেব সেগুলি Practical fieldএ আন্‌লেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন কোরে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধর্‌তে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্ত্তি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতে হিন্দু-ধর্ম্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন, এবং সে জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম ভারত হইতে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এ কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐরূপ দুর্দ্দশা তাঁর teachingএর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর followersদের (চেলাদের) দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চ্চা কোরে) তাদের heartএর (হৃদয়ের) উদারতা কমে গেল। তার পর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোনও তন্ত্রে নাই! বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথ ক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্ত্তিগুলি একবার

গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জান্‌তে পারবি।' রামানুজ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ সকল মহাপুরুষদের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?

স্বামীজি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট্ শরীর, তখন স্থানমাহাত্ম্য থাকাটায় বিচিত্র কি আছে? স্থান-বিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুলাগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐ সকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এই জন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে। তবে স্থির জান্‌বি, এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনও প্রধান তীর্থ নাই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নাই। ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপক) মাত্র। এই দেহরথের আত্মাকে দর্শন কত্তে হবে। পড়েছিস্ না—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি, "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"—এই বামনরূপী আত্মদর্শনই ঠিক জগন্নাথ-দর্শন। ঐ যে বলে, "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এর মানে হচ্ছে, তোর ভিতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিম্ভূতকিমাকার এই দেহরূপ

জড়পিণ্ডটাকে সর্ব্বদা আমি বলে ধরে নিচ্ছিস্, তাঁকে দর্শন কত্তে পার্‌লে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হতো, তা হলে বছরে বছরে কোটী জীবের মুক্তি হয়ে যেত;—আজ কাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ। তবে ৺জগন্নাথ সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বল্‌ছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্ত্তি অবলম্বনে উচ্চ হতে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়; অতএব ঐ মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমান্‌দের ধর্ম্ম আলাহিদা?

স্বামীজি। তাই ত, নহিলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারি-নির্দ্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth, তবে relative truth, different in degrees. মানুষ যা কিছু সত্য বলে জানে, সে সকলই ঐরূপ; কোনটা অল্প সত্য, কোনটা তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান্। এই আত্মা জড়ের ভিতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, জীবনামধারী মানুষের ভিতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগ্রত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stageএ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরে উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—'অবাঙ্‌ মনসগোচরম্'।

শিষ্য। মহাশয়, কোনও কোনও ভক্ত সম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—ঐ সকল কথা ছাড়িয়া সর্ব্বদা ভাবে থাক।

স্বামীজি। তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ কর্‌তে কর্‌তে তাদের ভিতরও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌বেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা কর্‌ছি, তাও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, অতএব সংসারের সম্বন্ধের মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির মত কোনও একটী ভাব ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা আমাদের ভাব কেমন করে হবে? ও সব আমাদের কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য, সর্ব্বভাবাতীত ভগবানের উপাসনা ও লাভ বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্ব্বদা বল্‌বি, শুন্‌বি, বিচার কর্‌বি। ঐরূপ কর্‌তে কর্‌তে কালে দেখ্‌বি—তোর ভিতরেও সিঙ্গি—(ব্রহ্ম) জেগে উঠ্‌বেন্। ঐ সব ভাব খেয়ালের পারে চলে যান্। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বল্‌ছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামী সমভিব্যাহারে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

পঞ্চদশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়—ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী মাস।

বিষয়—স্বামীজির বাল্য ও যৌবনের কয়েকটি কথা ও দর্শন—আমেরিকায় প্রকাশিত বিভূতির কথা—ভিতরে বক্তৃতার রাশি কে যেন ঠেলিয়া দিতেছে, এইরূপ অনুভূতি—আমেরিকার স্ত্রীপুরুষের গুণাগুণ—পাদরিদের ঈর্ষ্যাপ্রসূত অত্যাচার—চালাকী করিয়া জগতে মহৎ কাজ করা যায় না—ঈশ্বর-নির্ভর—নাগ মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বেলুড়ে, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্বামীজি মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও, জিনিস-পত্র এখনও সব গুছানো হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজি এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুসী হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, "দ্যাখ্ দেখি কেমন গঙ্গা—কেমন বাড়ী—এমন স্থানে মঠ না হলে কি ভাল লাগে?" তখন অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যার পর শিষ্য স্বামীজির সহিত দোতালার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে, নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজিকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল, এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজির বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজি বলিতে লাগিলেন,

"অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলাম, নৈলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌তুম্ রে ?"

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণ গান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানেই রামায়ণ গান হইত, স্বামীজি খেলা ধূলা ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। বলিলেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া বাড়ী ঘর ভুলিয়া যাইতেন। এবং 'রাত হইয়াছে' বা 'বাড়ী যাইতে হবে' ইত্যাদি কোনও বিষয়ের খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রে রামায়ণ গান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাটীর নিকটে কোনও এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হনুমানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রামায়ণের মধ্যে হনুমানের প্রতি স্বামীজির অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন, এবং অনেক সময় মঠে মহাবীরের একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন।

•পাঠ্যাবস্থায় দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদিগের সহিত কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়া শুনা করিতেন। কখন্ যে তিনি পড়া শুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

*　　　*　　　*　　　*

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মহাশয়! স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ vision দেখিতেন কি?"

স্বামীজি। স্কুলে পড়্বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান কর্তে কর্তে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম, বল্তে পারি না। ধ্যান শেষ হল—তখনও বসে আছি—এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তার মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোনও ভাব নাই। মহা শান্ত সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি। মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। যেন আমায় কিছু বল্‌বেন, এইরূপ ভাব। আমিও অবাক্ হয়ে তাঁর পানে চেয়েছিলাম। তার পর মনে কেমন একটা ভয় এলো—তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাহিরে গেলাম্। তার পর মনে হল, কেন এমন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পালালাম, হয় ত তিনি কিছু বল্‌তেন। আর কিন্তু সে মূর্ত্তির কখনও দেখা পাই নাই। কতদিন মনে হয়েছে, যদি তাঁর ফের দেখা পাই ত এবার আর ভয় কর্‌ব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর দেখা পাই নাই।

শিষ্য। তার পর এ বিষয় কিছু ভেবেছিলেন কি?

স্বামীজি। ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল কিনারা পাই নাই। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীজি বলিলেন,—"মন শুদ্ধ হলে, কাম-কাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত, অদ্ভুত! তবে ওতে খেয়াল রাখ্‌তে নাই। ঐ সকলে দিন রাত মন থাক্‌লে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনেছিস্ না—ঠাকুর বলতেন—'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচ্‌দুয়ারে।' আত্মাকে সাক্ষাৎ কত্তে হবে, ও সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে?"

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজি তন্ময় হইয়া কোনও বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ্‌! আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোকের ভিতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝ্‌তে পাত্তুম—মুহূর্ত্তের মধ্যে। কে কি ভাব্‌ছে—না ভাব্‌ছে, করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারোকে কারোকে বলে দিতুম; যাদের যাদের বল্‌তুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোন-রূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশ্‌তে আস্‌তো, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিক্‌ও মাড়াত না।"

যখন চিকাগো প্রভৃতি সহরে বক্তৃতা সুরু কল্লুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা—কখনও বা আরও বেশী লেকচার দিতে হত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহাক্লান্ত হয়ে পড়্‌লুম্। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। ভাব্‌তুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বল্‌বো? নূতন

ভাব, আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পর শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি, তাই ত এখন কি উপায় করা যায়? ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটু তন্দ্রার মত এলো। সেই অবস্থায় শুন্‌তে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কচ্ছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে সব যেন ইহজন্মে শুনি নাই, ভাবি নাই। ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ করে রাখ্‌লুম, আর বক্তৃতায় তাই বল্লুম। এমন যে কত দিন ঘটেছে, তার সংখ্যা নাই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি। কখনো বা এত জোরে জোরে বক্তৃতা হত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বল্‌ত, 'স্বামীজি, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে অত জোরে কথা কচ্ছিলেন?' আমি তাদের সে কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড।"

শিষ্য স্বামীজির কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল —"মহাশয়, তবে বোধ হয়, আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন, এবং স্থূলদেহে কখন কখনও তাহার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।"

শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন—"তা হবে।"

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজি বলিলেন, "সে দেশে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিতা। বিজ্ঞান দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিতা; তাই তারা আমায় অত খাতির কর্‌তো। পুরুষগুলো দিন রাত খাট্‌ছে, বিশ্রামের সময় নাই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে মহা বিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের রাজত্ব।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?

স্বামীজি। হয়েছিল বৈকি ? আবার যখন লোকে আমায় খাতির কত্তে লাগ্‌লো, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগ্‌লো। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ কত্তে বল্‌তো। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য কত্তুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকী দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য হয় না ; তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কায করে যেতুম। দেখ্‌তেও পেতুম্, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ কর্‌তো, তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত, এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাহিত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ—কেউ নাই! আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জান্‌তে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস, বাবা, সংসারে সবই দুনিয়া-দারী। ঠিক্ সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ সব দুনিয়াদারীতে ভোলে রে বাপ্! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক্, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে

চল্‌লে যাব—এই জান্‌বি বীরের কায। নতুবা এ কি বল্‌ছে, ও কি লিখ্‌ছে, এ সব নিয়ে দিন রাত থাক্‌লে, জগতে কোনও মহৎ কার্য্য করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস্‌নি ?—

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণাজনা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥"

লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক্‌ বা না হোক্‌, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক্‌, যেন ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘসে মেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হবার হোক্‌ গে, আমার ইষ্টলাভ আগে কর্‌বোই কর্‌বো—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাক্‌লে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর কত্তে পারে না।

শিষ্য। তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন ?

স্বামীজি। শাস্ত্রে নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যে ভাবে দৈব দৈব করে,

ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহাকাপুরুষতার পরিণাম; কিম্ভূত-কিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ চাপানর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যাপাপের গল্প শুনেছিস্ ত? সেই গোহত্যাপাপে শেষে বাগানের মালীককেই ভুগে মর্‌তে হলো। আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি' ব'লে পাপ পুণ্য দুইই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রের জল! সর্ব্বদা এ ভাবে থাকৃতে পার্‌লে ত সে মুক্ত। কিন্তু ভালোর বেলা 'আমি', আর মন্দের সময় 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতায়! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের ভিতর) ইদানীং—নাগ মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজি বলিলেন, "অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটী দেখা যায়, আহা তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!"

শিষ্য। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা ঠাকৃরুণ (নাগ মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজি। ঠাকুর তাঁকে জনক রাজার সহিত তুলনা কত্তেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক্, কথা শোনাও

যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব কর্‌বি। তিনি ঠাকুরের এক জন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য। মহাশয়, ও দেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজি। অমন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছিস্, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাক্‌লে তবে ও সব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ মহাশয় বাড়ীতে কিরূপে থাকেন?

শিষ্য। মহাশয়, কায কর্ম্ম ত কিছুই দেখি না। কেবল অতিথি-সেবা লইয়াই আছেন। পাল বাবুরা যে কয়টি টাকা দেন, তদ্ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হয়, তেমনি! কিন্তু নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সা ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা—সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের শরীরটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁষ্। বাস্তবিক শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (জ্ঞানাতীত অবস্থা) বলেন, আমার বোধ হয়, তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

পঞ্চদশ বল্লী।

স্বামীজি। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাস্‌তেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঐ একটী ঠাকুরের সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

ষোড়শ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নবেম্বর মাস।

বিষয়—কাশ্মীরে ৺ অমরনাথ দর্শন—৺ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে দেবীর বাণী শ্রবণ ও মন হইতে সকল সংকল্প ত্যাগ—প্রেতযোনির অস্তিত্ব—ভূত প্রেত দেখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখা অনুচিত—স্বামীজির প্রেতদর্শন এবং শ্রাদ্ধ ও সংকল্প দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করা।

স্বামীজি আজ দুই তিন দিন হইল, কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাশ্মীর হইতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজি কাহারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কন্ না; স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজির কাছে গল্প সল্প করে স্বামীজির মনটা নীচে আন্‌তে চেষ্টা করিস্।"

শিষ্য উপরে স্বামীজির ঘরে যাইয়া দেখিল—স্বামীজি মুক্ত পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্ম্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।" এই পর্য্যন্ত। স্বামীজির বাম নেত্রাভ্যন্তরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?" স্বামীজি "ও কিছু না" বলিয়া পুনরায় স্থির হইয়া

বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজি কোন্ কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজির পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন না?" পাদস্পর্শে স্বামীজির যেন একটু চমক্ ভাঙ্গিল; যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল। বলিলেন, "অমরনাথ দর্শনের পর হইতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা, যেন শিব বসিয়া আছেন; কিছুতেই নাম্‌ছেন না।" শিষ্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

স্বামীজি। অমরনাথে গিয়ে ও পরে ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা তামাক্ সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজি আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "অমরনাথে যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙ্গে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া আসা করে। আমার কেমন রোক্ হল, ঐ পথেই যাব। যাব ত যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কন্‌কনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ্ ফোটে।"

শিষ্য। শুনিয়াছি, উলঙ্গ হইয়া ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়, কথাটা কি সত্য?

স্বামীজি। হাঁ; আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলুম; তখন শীত গ্রীষ্ম কিছুই জাস্তে পারি

নাই। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য। পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি, সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীব জন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজি। হাঁ, ৩।৪ টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

শিষ্য। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি, গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় সত্য সত্য শিব দর্শন হইল।

স্বামীজি বলিলেন, "শুনেছি, পায়রা দেখ্‌লে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।"

অনন্তর স্বামীজি বলিলেন, আসিবার কালে তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই ৺ক্ষীর ভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান ও সাত দিন তথায় অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ১/ মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজির মনে উঠিয়াছিল, "মা ভবানী এখানে সত্য সত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির পুরাকালে ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলা কিছুই করিল না। হায় আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখন

উহা চুপ্ করিয়া দেখিতে পারিতাম না”—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, “আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে; আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোণার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস্; তোকে আমি রক্ষা করিব, না, তুই আমাকে রক্ষা করিবি?” স্বামীজি বলিলেন, “ঐ দৈববাণী শুনিয়া অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ ফট কর্‌বার্ সঙ্কল্পও ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।” শিষ্য অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, “যা কিছু দেখিস্ শুনিস্ তা তোর ভিতরে অবস্থিত আত্মার প্রতি-ধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নাই!”—স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, “মহা-শয়, আপনি ত বলিতেন, এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্যিক প্রতিধ্বনি মাত্র।” স্বামীজি গম্ভীর হইয়া বলি-লেন, “তা ভিতরেরই হোক্, আর বাইরেরই হোক্, তুই যদি নিজের কাণে আমার মত ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস্, তা হলে কি মিথ্যা বল্‌তে পারিস্? দৈববাণী সত্য সত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে—এমনি।”

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল; কারণ, স্বামীজির কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তি তর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, "মহাশয়, এই যে ভূত প্রেতাদি যোনির কথা শুনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে সকল কি সত্য সত্য আছে?"

স্বামীজি—সত্যি বই কি। তুই যা না দেখিস্, তা কি আর সত্যি নয়? তোর দৃষ্টির বাহিরে কত অযুতাযুত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুর্‌ছে। তুই দেখ্‌তে পাস্ না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নাই? তবে ঐ সব ভূতুড়ে কাণ্ডে মন দিস্‌নে, ভাব্‌বি ভূত প্রেত আছে ত আছে। তোর কার্য্য হচ্ছে—এই শরীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌লে ভূত প্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে হয়, উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জ্জন্মাদি বিশ্বাস বোধ হয়, খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না।

স্বামীজি। তোরা ত মহাবীর; তোরা আবার ভূত প্রেত দেখে পরলোক কি দৃঢ় বিশ্বাস কর্‌বি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়্‌লি—এই বিরাট্ বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জান্‌লি—এতেও কি আত্মজ্ঞান লাভ ভূত প্রেত দেখে কত্তে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূত প্রেত কখন দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজি বলিলেন, তাঁহার সংসার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দূরের

সংবাদ সকলও আনিয়া দিত। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থ-বিশেষে যাইয়া "সে মুক্ত হইয়া যাক্"—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শিষ্য এইবার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কিনা প্রশ্ন করিলে স্বামীজি কহিলেন, "উহা কিছু অসম্ভব নয়।" শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তি প্রমাণ চাহিলে স্বামীজি কহিলেন, "তোকে একদিন ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দিব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য এক দিন উহা বুঝাইয়া দিব।" শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজির কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

সপ্তদশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস।

বিষয়—স্বামীজির সংস্কৃত রচনা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে ভাব ও ভাষায় প্রাণসঞ্চার—ভাষাতে ওজস্বিতা কি ভাবে আনিতে হইবে—ভয় ত্যাগ করিতে হইবে—ভয় হইতেই দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রসার—সকল অবস্থায় অবিচল থাকা—শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা—স্বামীজির অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পাঠ—জ্ঞানের উদয়ে কোন বিষয়কেই আর অদ্ভুত মনে হয় না।

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজি এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ' * ইত্যাদি শ্লোক দুইটী তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজি "ওঁ হ্রীং ঋতং"† ইত্যাদি স্তবটী রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখিস্

---

* বীর বাণী পুস্তক দেখ।

† এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে স্বামীজি অন্য একদিন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সে স্তবটার কোনরূপ সংশোধন দরকার দেখ্‌লি কি?' তদুত্তরে শিষ্য বলে যে, সে তখন উহা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখে নাই। পরে ঐ স্তবের মূল কপি মঠে অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া না যাওয়ায় "ওঁ হ্রীং ঋতং" স্তবটী লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শিষ্যের নিকটে যে কপিখানি ছিল, তাহাই স্বামীজির স্ব স্বরূপ সম্বরণের প্রায় চারি বৎসর পর শিষ্যের পুরাতন কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ই উহা উদ্বোধনে প্রথম ছাপা হয়।

এতে কিছু ছন্দ পতনাদি দোষ আছে কিনা। শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

স্বামীজি যে দিন ঐ স্তবটী রচনা করেন, সে দিন স্বামীজির জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন! এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস, শিষ্য মহা মহা পণ্ডিতের মুখেও কখন শুনে নাই।

সে যাহা হউক, শিষ্য স্তবটী নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজি তাহাকে বলিলেন, "দ্যাখ্, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখ্তে লিখ্তে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।"

শিষ্য। মহাশয়, ও সব স্খলন নয়—উহা আর্ষ প্রয়োগ।

স্বামীজি। তুই ত বল্লি; কিন্তু লোকে তা বুঝ্বে কেন? এই সেদিন "হিন্দু ধর্ম্ম কি" বলে একটা বাঙ্গালায় লিখ্লুম্—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বল্ছে, কট মট বাঙ্গালা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনীসের ন্যায় ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়্তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার কত্তে হবে। এই দেখ্না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চাল চলন ভেঙ্গে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন

ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও করুচে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না, আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি? এখন এসব সন্ন্যাসীদের দূর দূরান্তরে প্রচারকার্য্যে যেতে হবে—ছাই মাখা, অৰ্দ্ধ উলঙ্গ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম ত জাহাজেই নেবে না; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পঁহুছিলেও তাকে কারাগারে অবস্থান কত্তে হবে। দেশ সভ্যতা ও সময়োপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্ত্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখ্‌বো মনে করুচি। সাহিত্য সেবিগণ হয়ত তা দেখে গাল মন্দ কর্‌বে। করুক্—তবু বাঙ্গালা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এখনকার বাঙ্গালা লেখকেরা লিখ্‌তে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়ার) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verbএর ভাব প্রকাশ কত্তে পাল্লে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখ্‌তে চেষ্টা কর্ দিকি। উদ্বোধনে ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বি। ভাষার ভিতর verb গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্? ঐরূপে ভাবের pause বা বিরাম দেওয়া। সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার মত দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র। ঐরূপ কর্‌লে মনে হয় যেন ভাষার দম নাই। সেজন্যই বাঙ্গালা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) করা যায় না। ভাষার

উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগ্গীর শীগ্গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের দাল ভাত খেয়ে শরীর যেমন্ ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার, চাল চলন, ভাব, ভাষাতে তেজস্বিতা আন্তে হবে। সব দিকে প্রাণের বিস্তার কত্তে হবে—সব ধমনীতে রক্ত প্রবাহ প্রেরণ কর্তে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণ স্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive কত্তে (বাঁচ্তে) পার্বে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অনেক কাল হইতে এদেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে। উহার পরিবর্ত্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব?

স্বামীজি। তুই যদি পুরোণো চাল্টা খারাপ বুঝে থাকিস্ ত যেমন বল্লুম নূতন ভাবে চল্তে শেখ্ না। তোর্ দেখাদেখি আর দশ জনে তাই কর্বে; তাদের দেখে আবার আর ৫০ জনে শিখ্বে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভিতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠ্বে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কায না করিস্, তবে জান্ব তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাযের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়—উৎসাহ, বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজি। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আন্তে হবে। একটা "মানুষ"

যদি তৈয়িরি হয়, ত লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক করে idea (ভাব) গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বল্‌তেন, 'ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।' সব দিকে practical হতে (কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মতের বা ভাবের বিকাশ দেখাতে) হবে। theoryতে theoryতে (মতে, মতে) দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যে ঠিক্ ঠিক্ ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্ম্মভাবসকলের practicality (কাযে পরিণত কর্‌বার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে কার্য্য করে যাবে। তুলসী দাসের দোঁহায় আছে শুনিস্‌নি—

হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার,
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চল্‌তে হবে। লোক্‌কে জান্‌তে হবে পোক্। তাদের ভাল মন্দ কথায় কাণ দিলে জীবনে কোন মহৎ কার্য্য কত্তে পারা যায় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শরীরে, মনে বল না থাক্‌লে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়্‌তে হবে; তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর্ করবি। "আমি হীন" "আমি হীন" বল্‌তে বল্‌তে মানুষ হীন হয়ে যায়—শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

যার মুক্ত অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হয়ে যায়, যে ভাবে আমি বদ্ধ, জান্‌বি, জন্মে জন্মে তার বন্ধন দশা। ঐহিক্ পারমার্থিক উভয় পক্ষেই ঐ কথা সত্য জান্‌বি। ইহ জীবনে যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কায হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ কর্‌তে কর্‌তে আসে ও যায়। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে এ কথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্ব্বদা বল্ "অভীঃ" "অভীঃ"। সকলকে শোনা "মাভৈঃ" "মাভৈঃ"—ভয়ই মৃত্যু —ভয়ই পাপ—ভয়ই নরক—ভয়ই অধর্ম্ম—ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (অসৎ বা মিথ্যা) ভাব আছে, সে সকলই এই ভয়রূপ সয়তান্ থেকে বাহির হয়েছে; এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব—ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব— ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডির বাইরে কাহাকেও যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বল্‌ছেন, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"। যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন—সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন—সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—"অভীঃ" "অভীঃ"।

বলিতে বলিতে স্বামীজির সেই নীলোৎপল নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন "অভীঃ" মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বামিরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন! শিষ্য সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষের

কাছে থাকিলে ও কথা শুনিলে মৃত্যুভয়ও যেন কোথায় পলায়ন করে!

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—"এই দেহ ধারণ করে কত সুখে দুঃখে—কত সম্পদ বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জান্‌বি, ও সব মুহূর্ত্তকালস্থায়ী। ঐ সকলকে গ্রাহ্যের ভিতর আন্‌বি নি। 'আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা'—এইভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত কত্তে হবে। 'আমার জন্ম নাই, আমার মৃত্যু নাই, আমি নির্লেপ আত্মা,' এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পার্‌লে দুঃখ কষ্টের সময় আপনা আপনি ঐ ভাব মনে উঠে পড়্‌বে—চেষ্টা করে আর আন্‌তে হবে না। এই যে সে দিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ী গিয়েছিলুম। * সেখানে এমন হাঁপ ধোর্‌লো যে, প্রাণ যায়। ভিতর থেকে কিন্তু তখন শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌লো—"সোঽহং সোঽহং"। বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা কর্‌ছিলুম আর দেখ্‌ছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্চে "সোঽহং" "সোঽহং"—কেবল শুন্‌তে লাগ্‌লুম—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"!

শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতি সকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।

* স্বামীজি এক সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বৈদ্যনাথে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়াছিলেন।

স্বামীজি। না রে! শাস্ত্রও পড়্‌তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্র-পাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুল্‌চি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত পড়া হবে। অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিষ্য। আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজি। যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহা বৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তার কাছে ব্যাকরণ পড়্‌তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহা পণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বুঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা কত্তে পাল্লুম না। চার্ দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন্, "স্বামীজি! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম্ম বুঝাতে পাল্লুম না। আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।" ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভৎ'সনা এলো। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়্‌তে লাগ্‌লুম্। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল; তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বল্লুম। অধ্যাপক শুনে বল্লেন, আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা না কত্তে পাল্লুম, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এরূপ চমৎকার ব্যাখ্যা কিরূপে উদ্ধার কর্‌লেন? তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগ্‌লুম।

মন্ত্রের একাগ্রতা থাক্‌লে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরু চূর্ণ কর্ত্তে পারা যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত!

স্বামীজি। অদ্ভুত বলে বিশেষ একটা কিছু নাই। অজ্ঞতাই অন্ধকার। তাইতে সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুতে আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, তাও লুকিয়ে যায়। যাকে জান্‌লে সব জানা যায়, তাঁকে জান্—তাঁর কথা ভাব্—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা কর্‌লে তা অবশ্যই পুনরায় অপরের জীবনে সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্ব্বভূতে সমান। কেবল প্রতি-ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মাকে বিকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্। দেখ্‌বি, বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ কর্‌বে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাসিনী। আত্মপ্রকাশ হলে, দেখ্‌বি, দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহগর্জ্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর—জীবকে অভয় দিয়ে বল্—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। Arise, Awake and stop not till the goal is reached.

অষ্টাদশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজির নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা—ঐ সমাধি হইতে কাহারা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম—অবতার পুরুষদিগের অদ্ভুত শক্তির কথা ও তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ—শিষ্যের স্বামীজিকে পূজা।

শিষ্য আজ দুদিন হইল বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজির কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বামীজির কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল চির-উৎসব। কত ধর্ম্মচর্চ্চা—কত সাধন ভজনের উদ্যম—কত দীন-দুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে! সন্ন্যাসী মহারাজগণ সকলেই মহা উৎসাহী—মহাদেবের গণরূপে স্বামীজির আজ্ঞাপালনে উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মঠে পূজা ও প্রসাদের বিপুল আয়োজন—সমাগত ভদ্রলোকের জন্য সর্ব্বদা প্রসাদ প্রস্তুত।

আজ স্বামীজি শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। স্বামীজির সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না। প্রসাদ গ্রহণান্তে সে স্বামীজির পদসেবা করিতেছে, এমন সময়ে স্বামীজি বলিলেন, "এমন জায়গা ছেড়ে তুই কিনা কল্‌কাতায় যেতে চাস্—এখানে কেমন পবিত্র ভাব—কেমন

গঙ্গার হাঁওয়া—কেমন সব সাধুর সমাগম। এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি ?”

শিষ্য। মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি, কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দেন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজি। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তার পর সন্ধ্যার সময় ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নাই মনে হয়েছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, দেশ, কাল, আকাশ, সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লয় হয়ে গিছ্‌লুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলাম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল—জল, আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। “অবাঙ্‌মনসগোচরম্” কথাটা ঐ সময়েই ঠিক্ ঠিক্ উপলব্ধি হয়। নতুবা আমি ব্রহ্ম, একথা সাধক যখন ভাব্‌ছে বা বল্‌ছে, তখনও ‘আমি’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—দ্বৈতভাণ থাকে। তার পর ঐরূপ অবস্থা লাভের জন্য বারম্বার চেষ্টা করেও, আর আন্‌তে পার্‌লুম না। ঠাকুরকে জানাতে বল্‌লেন—

"দিবারাত্র ঐ অবস্থায় থাক্‌লে মার কায হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আন্‌তে পার্‌বি না; কায করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আস্‌বে।"

শিষ্য। নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক্ ঠিক্ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে, তবে কি কেহই আর, পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈত-ভাবের রাজত্বে, সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজি। ঠাকুর বল্‌তেন, একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতকামে ঐ সমাধি থেকে নেবে আস্‌তে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিন মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।

শিষ্য। মন বিলুপ্ত হয়ে যখন সমাধি হয়—মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না—তখন আবার বিক্ষেপের—আবার অহংজ্ঞান লইয়া সংসারে ফিরিবার—সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে, কি নিমিত্তই বা, সমাধি অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজি। বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। কিন্তু অবতারেরা এক আধটা সামান্য বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন্। তাই ধরে আবার superconscious state থেকে conscious stateএ (জ্ঞানাতীত অদ্বৈতভূমি থেকে 'আমি-তুমি' জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে) আসেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যদি এক আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে

নিঃশেষ নিরোধ সমাধি অবস্থা বলি কিরূপে? কারণ, শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজি। মহাপ্রলয়ের পরে তবে সৃষ্টিই বা আবার কেমন করে হবে? মহা প্রলয়েও ত সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তাহার পরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—সৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলিতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্ত্তনের ন্যায় অবতার পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুত্থানও তদ্রূপ অপ্রাসঙ্গিক কেন হইবে?

শিষ্য। আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির (আপনি যেমন বলেন) potential (অব্যক্ত) আকার ধারণ মাত্র?

স্বামীজি। তা হলে আমি বল্‌বো, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নাই—যাহা নির্লেপ ও নির্গুণ,—তাঁর দ্বারা এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভবে, তার জবাব দে।

শিষ্য। এ ত seeming projection. সে কথার উত্তর ত শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশটা মরু মরীচিকার মত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তি বশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজি। সৃষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্ব্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি হইতে ব্যুত্থনটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস্ ত। জীব স্বতঃই ব্রহ্মস্বরূপ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে "আমি আত্মা" এই অনুভব কর্ত্তে চাস্, সেটাও তা হলে ভ্রম;—কারণ, শাস্ত্রে বল্‌ছে, You are already that (তুই সর্ব্বদা ব্রহ্মই যে হয়ে রয়েছিস্)। অতএব "অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধি-মনুতিষ্ঠসি"—তুই যে সমাধি লাভ কত্তে চাচ্ছিস্, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য। এ ত বড় মুস্কিলের কথা; আমি যদি ব্রহ্মই হই, তবে ঐ বিষয় সর্ব্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজি। Conscious plane এ ('তুমি—আমি'র রাজত্ব দ্বৈত-ভূমিতে) ঐকথা অনুভূতি কত্তে হলে একটা করণ বা যাহা দ্বারা অনুভব কর্‌বি, তা একটা চাই (some instrumentality)। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা ত জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন—"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা"—চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলিয়া মনে হয়—এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ বলিয়া বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে যে জান্‌তে পার্‌বি না, একথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে

হবে। মনের পারে আর ত কোন করণ নাই— এক আত্মাই আছেন সুতরাং যাকে জান্‌বি, সেটাই আবার করণ স্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই জন্য শ্রুতি বল্‌ছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। ফল কথা, conscious planeএর (দ্বৈত-ভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম করণাদির দ্বৈত ভাণ নাই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। ভাষান্তর নাই বলে ঐ অবস্থাটীকে 'প্রত্যক্ষ' করা বল্‌ছি। নতুবা সে অনুভব প্রকাশের ভাষা নাই। শঙ্করাচার্য্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাষ দেন—সে জন্যই বলে (আপ্তপুরুষের) অনুভব হইতেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু নুণের পুতুলের সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়ে গলে যাওয়ার ন্যায়; বুঝ্‌লি? মোট কথা হচ্ছে যে, "তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম" এই কথাটা "জান্‌তে" হবে মাত্র; তুই সর্ব্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান্ থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে মায়া বলে) এসে সেটা বুঝ্‌তে দিচ্ছে না; সেই সূক্ষ্ম জড় রূপ উপাদানে নির্ম্মিত মন রূপ পদার্থটা প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকার স্বরূপ;

পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝ্‌তে পার্‌বি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মন লয় হয়ে যাবে; তখনই অনুভূতি হবে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

অতঃপর স্বামীজি বলিলেন, 'তোর ঘুম্ পাচ্ছে বুঝি?—তবে শো।' শিষ্য স্বামীজির পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাত্রে স্বামীজির সুনিদ্রা না হওয়ায় মাঝে মাঝে উঠিতে লাগিলেন; শিষ্যও তখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আবশ্যক মত সেবা করিতে লাগিল। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল এবং শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল, স্বামীজি মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিবার জন্য তাহার মন এখন ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং ঐ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজির অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামীজি সম্মত হইলে, সে কতকগুলি ধূস্তূর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করতঃ বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "তোর পূজা ত হল, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে! তুই কিনা ঠাকুরের পূজার বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পূজা কর্‌লি?" কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতেই স্বামী

প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, দেখ্, আজ কি কাণ্ড করেছে !!! ঠাকুরের পূজার থালা বাসন গন্ধ চন্দন এনে ও আজ আমার পূজা করেছে।" স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তা বেশ করেছে ; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন ?" কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু ; অখাদ্য দূরে থাকুক্ কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্য্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজি শিষ্যকে কখন কখন 'ভট্‌চায্' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতর্জলযোগ সময়ে বিলাতি বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজি, সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'ভট্‌চায্‌কে ধরে নিয়ে আয় ত।' আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজি ঐ সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদ স্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজি তাহাকে বলিলেন, "আজ কি খেলি তা জানিস্ ? এগুলি মুর্গির ডিমে তৈয়ারি!" উত্তরে সে বলিল, "যাহাই থাকুক্ আমার জানিবার প্রয়োজন নাই ; আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।" শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, "আজ থেকে তোর জাত্, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপ, পুণ্যাদি অভিমান জন্মের মত দূর হোক্—আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।"

স্বামীজির সেদিনকার অযাচিত অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া শিষ্য মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে মনে করে।

অপরাহ্ণে স্বামীজির কাছে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথ-

নাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে স্বামীজি অনেক দিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজিকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বামীজিকে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "একদিন এখানে থেকেই যান্ না"। মন্মথ বাবু তাহাতে "আর একদিন এসে থাকা যাবে" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া নীচে নামিতে নামিতে জনৈক বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, "ইনি যে পৃথিবীতে একটা মহাকাণ্ড করে তবে ছাড়্বেন, তা আমরা পূর্ব্বেই মান্দ্রাজে টের পেয়েছিলুম্। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা মানুষে দেখা যায় না।"

স্বামীজি মন্মথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধার অবধি আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন এবং ময়দানে কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

ঊনবিংশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ বাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামীজির শিষ্যকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করা—শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের জন্য এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—ইংলণ্ডে চাকুরে লোকদিগের হীন-জ্ঞানে অবজ্ঞা—ভারতে শিক্ষিতাভিমানী লোকদিগের অকর্ম্মণ্যতা—যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে—ইতর জাতিদিগের কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা ভারতের ভদ্রজাতীয়দিগের অপেক্ষা অধিক—ইতর জাতিরা এইবার জাগিতেছে ও নিজ ন্যায্য পাওনা গণ্ডা ভদ্র সমাজের নিকট হইতে আদায় করিবার উপক্রম করিতেছে—ভদ্রজাতিরা তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে উভয় জাতিরই কল্যাণ হইবে—ইতরজাতীয়দের গীতোক্ত ভাবে শিক্ষা দিলে তাহারা নিজ নিজ জাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করা দূরে থাকুক, গৌরবের সহিত সম্পন্ন করিতে থাকিবে—ভদ্রজাতীয়েরা ঐরূপে ইতরজাতীয়দের এখন সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে কি ফল দাঁড়াইবে।

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজি বলিলেন, "কি হবে আর চাকুরী করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।" শিষ্য তখন এক স্থানে একটী প্রাইভেট্ মাষ্টারী করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য্য-সম্বন্ধে শিষ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন, "অনেক দিন মাষ্টারী করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না।

দিন রাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারী করিস্ নি।"

শিষ্য। তবে কি করিব?

স্বামীজি। কেন? যদি তোর্ সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে, যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দিব। দেখ্‌বি, পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেল্‌তে পার্‌বি।

শিষ্য। কি ব্যবসায় করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজি। পাগলের মত কি বক্‌ছিস্? ভিতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। 'শুধু আমি কিছু নয়' ভেবে ভেবে বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস্। তুই কেন?—সব জাত্‌টা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়,—দেখ্‌বি—ভারতেতর দেশে লোকের জীবনপ্রবাহ কেমন্ তর্ তর্ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর, তোরা কি কচ্ছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত "চাকরী দাও, চাকরী দাও" বলে চেঁচাচ্ছিস্। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে—তোরা কি আর মানুষ আছিস্? তোদের মূল্য এক কাণাকড়াও নয়। এমন সজলাসফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব কর্‌ছেন, সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নাই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই

অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা ? ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষা যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদ বেদান্তের বড়াই করিস্! যে জাত সামান্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান কর্‌তে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস্ জন্মায়। বিদেশী লোক্ সেই raw material (পণ্যদ্রব্য) নিয়ে তার সাহায্যে সোণা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মর্‌ছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর, তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পূরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস্!

শিষ্য। কি উপায়ে অন্ন সংস্থান হইতে পারে, মহাশয় ?

স্বামীজি। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোকে কাপড় বেঁধে বল্‌ছিস্, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোকের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেখ্‌বি—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা ইয়ুরোপে পথে পথে ফিরি কর্‌গে। দেখ্‌বি—ভারত-জাত জিনিসের এখনো কত

কদর্। আমেরিকায় দেখ্‌লুম—হুগ্‌লি জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি করে করে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যা বুদ্ধি কম? এই দেখ্‌না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ের গাউন তৈয়ারি করে বিক্রী কর্‌তে লেগে যা, দেখ্‌বি কত টাকা আসে।

শিষ্য। মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্র বিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজি। নেবে—কি—না, তা আমি বুঝ্‌ব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি। আমার বহু বন্ধু বান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচয়) করে দিচ্চি। তাদের ভিতর ঐ গুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দিব। তার পর দেখ্‌বি—কত লোক তাদের follow (অনুকরণ) কর্‌বে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বিনি।

শিষ্য। ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজি। আমি যে কোরে হোক্ তোকে Start (কার্য্যারম্ভ) করিয়ে দিব। তার পর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর কর্‌বে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং"—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস্ তাও ভাল—তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর

যদি success (সফল) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাট্‌বে ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজি। তাই ত বল্‌ছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নাই—আত্মপ্রত্যয়ও নাই। কি হবে তোদের ? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম্ম। হয় ঐ প্রকার উদ্যোগ, উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য মান্য, শ্রীমান্) হ—নয় ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ বিদেশের লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর্। তবে তো আমাদের মত ভিক্ষা মিল্‌বে। আদান প্রদান না থাক্‌লে কেউ কারোর দিকে চায় না। দেখ্‌ছিস্ তো আমরা দুটো ধর্ম্মকথা শুনাই—তাই গৃহস্থেরা আমাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই কর্‌বিনি, তোদের লোকে অন্ন দিবে কেন ? চাকরীতে, গোলামীতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না !—কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না ! ইহা নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা ! ওদেশে দেখ্‌লুম—যারা চাকরী করে, parliamentএ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দ্দিষ্ট। যারা—নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বস্‌বার জন্যই front seats (সাম্‌নের আসনগুলি)। ও সব দেশে জাত্ ফাতের উৎপাত নাই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে—তোদের অন্ন পর্য্যন্ত

জুট্‌ছে না। একটা ছুঁচ গড়্‌বার ক্ষমতা নাই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষ গুণ বিচার) কর্ত্তে যাস্‌—আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা শিল্পবিজ্ঞান কর্ম্মতৎপরতা শিখ্‌গে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখ্‌বে। কোথাও কিছু নেই, কেবল congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামিচি কর্‌লে কি হবে?

শিষ্য। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজি। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা কর্ত্তে পার্‌লেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ কত্তে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল পরার্থতৎপরতা সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সেই কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব ইস্কুল কলেজে পড়ে, তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত্‌ তৈয়ারি হচ্ছিস্‌। কেবল machineএর (কলের) মত খাট্‌ছিস্‌; আর 'জায়স্ব' 'ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষী স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস্‌। এই যে চাষা ভুষা, মুদি মুদ্দফরাস্‌—এদের কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের

চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন কর্‌ছে—মুখে কথাটী নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। Capital (পয়সা) তাদের হাতে গিয়ে পড়্‌ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নাই। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল চাল্ বদ্‌লে দিচ্ছে; অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস্—এখন এরা তার প্রতিশোধ দিবে। আর তোরা "হা চাকুরী যো চাকুরী" করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য। মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতি সকল ত আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবন সংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজি। তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না হয় না পড়েছে। তোদের মত সার্ট কোট পরে সভ্য না হয় না-ই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এলো গেলো! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর-শ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ কর্‌লে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ কর্‌লে হা হুতাশ লেগে যায়—তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ কর্‌লে

মহামারীতে সহর উজোড় হয়ে যায়। শ্রমজীবীরা কার্য্য বন্ধ কর্‌লে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট-লোক ভাবৃছিস্? আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস্!

জীবনসংগ্রামে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোক-দিগের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নাই। ইহারা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একই ভাবে এতদিন কার্য্যই করে এসেছে —আর বুদ্ধিমান্ চতুর লোকেরা ইহাদের পরিশ্রম ও উপা-র্জ্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝ্‌তে পাচ্চে ও উহার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় কর্‌তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় ইতর জাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে—ছোট লোকদের ভিতর আজ কাল এত যে ধর্ম্মঘট হচ্ছে, উহাতেই ঐকথা বুঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা কর্‌লেও ভদ্র জাতেরা, ছোট জাতদের আর দাবাতে পার্‌বে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য কর্‌লে ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই ত বলি, তোরা এই massএর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাইতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল্‌গে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ

—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না"। তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও ত আবার কালে আমাদের মত উর্ব্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে?

স্বামীজি। তা কেন হবে? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাক্‌বে—জেলে জেলেই থাক্‌বে—চাষা চাষই কর্‌বে। জাত-ব্যবসা ছাড়্‌বে কেন? "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ"—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়্‌বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাতে আরো ভাল করে কত্তে পারে, সেই চেষ্টা কর্‌বে। দু দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভিতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল

বল্ দেখি? ঐরূপ sympathy (সাহায্য ও সহানুভূতি) পেলে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনো যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলে বোধ হয়। ভারতবর্ষে ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজি—তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদিগের) কল্যাণ নাই। তোরা চিরকাল যা করে আস্‌ছিস্—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে, সব ধ্বংস হয়ে যাবি। এই mass (ভদ্রেতর সাধারণ) যখন জেগে উঠ্‌বে আর তাদের উপর তোদের (ভদ্র লোকদের) অত্যাচার বুঝ্‌তে পার্‌বে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভিতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দিবে। ভেবে দেখ্—গল্ জাতের হাতে—অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা—কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এই সব নীচ জাতদের ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগ্‌বে—একদিন নিশ্চয়ই জাগ্‌বে, তখন তারাও তোদের কৃতোপকার বিস্মৃত হবে না। তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—

"ও সব কথা এখন থাক্—তুই এখন কি স্থির কর্‌লি, তা বল্। যা হয় একটা কর্। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ্; নয়তো আমাদের মত "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়"—যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা। কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে ত দেখেছিস্ সবই ক্ষণিক্—"নলিনীদল-গতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং"। অতএব যদি এই আত্ম-প্রত্যয় লাভ কর্‌তে উৎসাহ হয়ে থাকে ত আর কালবিলম্ব করিস্ না। এখুনি অগ্রসর হ। "যহদরেব বিরজেৎ তহদরেব প্রব্রজেৎ"। পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়-বাণী শুনা—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

বিংশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটি।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—উদ্বোধন পত্রের প্রতিষ্ঠা—উক্ত পত্রের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতের অশেষ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার—কি উদ্দেশ্যে স্বামীজি ঐ পত্র বাহির করেন,—ঠাকুরের সন্ন্যাসীসন্তানদিগের ত্যাগ ও অধ্যবসায়—গৃহীদের কল্যাণের জন্যই পত্র প্রচারাদি—উদ্বোধন পত্র কি ভাবে চালাইতে হইবে—জীবন উচ্চভাবে গড়িবার উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে—কাহাকেও ঘৃণা বা ভয় দেখান কর্ত্তব্য নহে—ভারতের অবসন্নতা ঐরূপেই আসিয়াছে—শরীর সবল করা।

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া যায়, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজি প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর অর্থসাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামীজির নিজের নিকটে এক সহস্র টাকা ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থভক্ত * আর এক সহস্র ধার দিলেন—ঐ টাকায় কার্য্যারম্ভ

* হরমোহন মিত্র।

হইল। একটী প্রেস্ * খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার রামচন্দ্র-মৈত্রের গলিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটীতে ঐ প্রেস্ স্থাপিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজি ঐ পত্রের "উদ্বোধন" নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামীজির আদেশে উহার মুদ্রণ ও প্রচারকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কখন ভক্ত গৃহস্থের ভিক্ষান্নে, কখন অনশনে, কখন প্রেস্ ও পত্র সংক্রান্ত কর্ম্মোপলক্ষে পায়ে হাঁটিয়া ৫ ক্রোশ পথ চলিয়া— এইরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত ঐ পত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, পয়সা দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার তখন সংস্থান ছিল না এবং স্বামীজির আদেশ ছিল, পত্রের জন্য গচ্ছিত টাকার একটী পয়সাও পত্রে ব্যয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে খরচ করিতে পারিবে না। স্বামী ত্রিগুণাতীত সেজন্য ভক্তদিগের আলয়ে ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চালাইয়া ঐ আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজি নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহিভক্তগণই এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। কোনরূপ অশ্লীলতাব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনাদি যাহাতে এই পত্রে প্রকাশিত না হয়, সে বিষয়ও স্বামীজি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সঙ্ঘরূপে পরি-

* প্রেসটি স্বামীজির জীবনকালেই নানা কারণে বিক্রয় করা হয়।

গত রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণকে স্বামীজি এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত পত্র সহায়ে জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে তিনি তাহার সহিত "উদ্বোধন" পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন—

স্বামীজি। (পত্রের নামটী বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজি। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়্‌তে হবে।

শিষ্য। কি রূপ?

স্বামীজি। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আন্‌তে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) কল্লে, ভাষার দম্ কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verbএর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপে প্রবন্ধ লিখ্‌তে আরম্ভ কর্। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপ্‌তে দিবি।

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজি। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্, ঠাকুরের—এই সব সন্ন্যাসী

সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধূনি জ্বালিয়ে বসে থাক্‌তে জন্মেছে? ইহাদের যে, যখন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক্ হবে। এদের কাছে কাজ কি কোরে কত্তে হয়, তা শেখ্। এই দেখ্ আমার আদেশ পালন কত্তে ত্রিগুণাতীত সাধন ভজন ধ্যান ধারণা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্য্যে নেবেছে। একি কম sacrificeএর (ত্যাগস্বীকারের) কথা—আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্ দেখি? Success (কাজ হাসিল্) করে তবে ছাড়্‌বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর গৃহাদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে।

স্বামীজি। কেন? পত্রের প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম বুঝি তুই সাধন ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস্? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নাই। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মাগছেলে নাই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল ও আয় বৃদ্ধি) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘগঠন, সেবাশ্রম স্থাপন আরো কত কি

হিতকর কার্য্যে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা ত গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ কর্‌ছিনি। শুদ্ধ পরহিতেই আমাদের সকল movement (কার্য্য)—এটা জেনে রাখ্‌বি।

শিষ্য। তাহা হইলেও সকলে এভাব লইতে পারিবে না।

স্বামীজি। নাই বা পাল্লে। তাতে আমাদের এলো গেলো কি ? আমরা criticism (নিন্দা সুখ্যাতি) গণ্য করে কার্য্যে অগ্রসর হই না।

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজি। তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায় ? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনা-মূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য। আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজি। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দিব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি তোদের এখনও হয় নাই। সেটা কর্‌তে এই সব সর্ব্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কায করে করে মরে যাবে তবু হট্‌বার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (নিন্দা) শুন্‌লেই দুনিয়া আঁধার দেখিস্।

শিষ্য। সে দিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পূজা করিয়া তবে কায আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজি। আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিকেন্দ্রের এক একটী ray (কিরণ-ধারা)। ঠাকুরকে পূজা করে, কাযটা আরম্ভ করেছে? বেশ করেছে। কৈ আমায় তো পূজার কথা কিছু বল্লে না।

শিষ্য। মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন—"তুই আগে স্বামীজির কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বো।"

স্বামীজি। তুই গিয়ে বলিস্, আমি তার কার্য্যে খুব খুসী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পার্‌বি, তাকে সাহায্য করিস্। উহাতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজি ব্রহ্মানন্দ স্বামীজিকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে উদ্বোধনের জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজি পুনরায় শিষ্যের সহিত উদ্বোধন পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতেছি।

স্বামীজি। উদ্বোধনে সাধারণকে কেবল positive ideals (সকল বিষয় গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thought (নেই নেই ভাবে) মানুষকে weak (নির্জ্জীব) করে দেয়। দেখছিস্ না, যে সকল মা বাপ ছেলেদের দিন রাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না,' 'বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম children in the region of higher thoughts—(ভাব রাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মত তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive idea (জীবন গড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌বে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ কর্‌ছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে কর্‌তে পার্‌বে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে কর্‌তুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজি একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

ধর্ম্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক সিট্‌কানো, ব্যাপার বলে যেন বুঝিস্‌ নি। "Physical, mental, spiritual (শরীর, মন ও আত্মা-সম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive idea (গড়িবার ভাব সকল) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (সবল হইবার ও জীবন গড়িবার ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুল্‌তে হবে। প্রথম ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাত্‌টাকে তুল্‌তে হবে। তার পর জগৎটাকে তুল্‌তে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই উহা। তিনি জগতে কারো ভাব নষ্ট করেন নাই। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুল্‌তে হবে—জাগাতে হবে—বুঝ্‌লি ?

"তোদের History, literature, Mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্চে! মানুষকে কেবল বল্‌ছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নাই! তাই এই অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে

দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। উদ্বোধন কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি। তবে জান্‌বো—তোর বেদ বেদান্ত পড়া স্বার্থক হয়েছে। কি বলিস্—পার্‌বি ?

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয় !

স্বামীজি। আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত কর্‌তে তোকে শিখ্‌তে হবে ও সকলকে শিখাতে হবে। দেখ্‌ছিস্‌নে এখনো রোজ আমি ডাম্‌বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম কর্‌বি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হওয়া চাই)। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর কল্লে চল্‌বে কেন ? শরীরটা সবল কর্‌বার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পার্‌লে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন কর্‌বে। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধের জন্যই এখন educationএর (শিক্ষার) দরকার।

একবিংশ বল্লী।

স্থান—কলিকাতা।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতির সহিত স্বামীজির আলিপুরের পশুশালা দেখিতে গমন—পশুশালা দেখিবার কালে কথোপকথন ও পরিহাস—দর্শনান্তে পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের বাসায় চা পান ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কথোপকথন—ক্রমবিকাশের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা, চূড়ান্ত মীমাংসা নহে—ঐ বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলির মত—বাগবাজারে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজির পুনরায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কথোপকথন—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশের কারণ মানবেতর প্রাণিজগতে সত্য হইলেও মানবজগতে সংযম এবং ত্যাগই সর্ব্বোচ্চ পরিণামের কারণ—স্বামীজি সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বাগ্রে শরীর সবল করিতে কেন বলিয়াছেন।

আজ তিন দিন হইল, স্বামীজি বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজির সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, "তোরা আগে চলে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে করিয়া আড়াইটা আন্দাজ রওনা হইলেন। তখন ঘোড়ার ট্রাম। বেলা প্রায় ৪টার

সময় পশুশালায় উপস্থিত হইয়া তিনি বাগানের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীজি আসিতেছেন শুনিয়া রামব্রহ্ম বাবু সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাগানের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রায় সাড়ে চারটার সময় স্বামীজি নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবুও পরম সমাদরে স্বামীজি ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া পশুশালার ভিতরে লইয়া যাইলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্ম বাবু উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের মতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রম-পরিণতি হইয়াছে, কখন কখন তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজিও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।" কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজি শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের

মতে এই সাপই কাল-পরিণমনে কচ্ছপ হয়েছে ;—তা হলে তোরা সাপও খাস্!” শিষ্য শুনিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল—

“মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া যাইলে যখন তাহার পূর্ব্বাকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, একথা কেমন করিয়া বলিতেছেন ?”

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি ও রামব্রহ্ম বাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি রক্ষিত ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্ম বাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহ ব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ-গর্জ্জন এবং সাগ্রহ-ভোজন শুনিবার ও দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থিত রামব্রহ্ম বাবুর বাসা-বাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজি অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্ম বাবু। ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যে ভাবে বুঝাইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

স্বামীজি। ডারুইনের কথা সঙ্গত হইলেও evolutionএর (ক্রমবিকাশবাদের) কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

রামব্রহ্ম বাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি ?

স্বামীজি। সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণা।

রামব্রহ্মবাবু। সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজি।—নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন), natural selection (প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন) প্রভৃতি যে সকল নিয়মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু ঐ সকলের একটীও উহার কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক speciesএ (জাতিতে) পরিণতি "প্রকৃতির আপূরণের" (প্রকৃত্যাপূরাৎ) দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstaclesএর সঙ্গে দিন

রাত struggle (লড়াই) করে যে উহা সাধিত হয়, তাহা নহে। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতা লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয় (যাহা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে) তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রম-বিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশ-কল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়, জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির এবং বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্ব্বতোভাবে সরে দাঁড়াইলেই পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তর-সমূহে যাহাই হোক্, উচ্চস্তরসমূহে কিন্তু প্রতিবন্ধক-গুলির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করেই যে উহাদিগকে অতিক্রম করা যায়, তাহা নহে; দেখা যায়, সেখানে, শিক্ষা দীক্ষা, ধ্যান ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacles (প্রতিবন্ধক) গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য্য না বলিয়া কারণরূপে নির্দ্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়কারী বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হাজার পাপীর

প্রাণ সংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌লে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য struggle theory বা জীব-সকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভরূপ মতটা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্ম বাবু স্বামীজির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অবশেষে বলিলেন—"আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের ভারতবর্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার evolution theoryর (ক্রম-বিকাশ বাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।"

বিদায় কালে রামব্রহ্ম বাবু বাগানের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া স্বামীজিকে বিদায় দিলেন এবং স্বামীজির সঙ্গে সুবিধামত পুনরায় একদিন নিরিবিলি দেখা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবু এ জীবনে স্বামীজির নিকট আসিবার ঐ অবসর পাঁইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। কারণ, ঐ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজি ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন সেখানে স্বামী যোগানন্দ, ৺শরচ্চন্দ্র সরকার, শশিভূষণ ঘোষ (ডাক্তার), বিপিনবিহারী ঘোষ (ডাক্তার), শান্তিরাম ঘোষ প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুগণ এবং স্বামীজির দর্শনাভিলাষে আগত অপরিচিত পাঁচ ছয় জন লোকও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি অদ্য পশুশালা দেখিতে যাইয়া রামব্রহ্ম বাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের (evolution theory) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া, ইঁহারা সকলেই ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব তিনি আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজি। কেন, কি বুঝিস্ নি?

শিষ্য। এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উল্‌টো কথা বলিলেন।

স্বামীজি। উল্‌টো বল্‌বো কেন? তুই-ই বুঝ্‌তে পারিস্ নি। Animal kingdom বা প্রাণীজগতে আমরা সত্য সত্যই struggle for existence, survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। তাই ডারুইনের theory (মত) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু

Human kingdom বা মনুষ্য জগতে যেখানে ration-alityর (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাশ, সেখানে ঐ নিয়মের উল্‌টোই দেখা যায়। মনে কর্ যাদের আমরা really great men (বাস্তবিক বড়লোক) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি তাদের বাহ্যিক struggle একেবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। Animal kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে Instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয় ততই তাতে rationalityর (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাশ। এই জন্য animal kingdomএর ন্যায় rational human kingdomএ পরের ধ্বংস সাধন করে, pro-gress (উন্নতি) হতে পারে না! মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণ বিকাশ) এক মাত্র sacrifice (ত্যাগের) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) কর্‌তে পারে মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণীজগতে যে যত ধ্বংস কত্তে পারে সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং struggle theory—(জীবন সংগ্রাম মত) ঐ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) কত্তে পেরেছে সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdomএ (মানবেতরপ্রাণীজগতে) স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle

(সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয় Human plane of existenceএ (মানবজগতে) মনের উপর আধিপত্য লাভের জন্য বা সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত "বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্য জগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়!

শিষ্য—তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজি—তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (জ্ঞান বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physiqueটা (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) কর্‌বি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণ বিকাশ স্থল) মানুষপদবাচ্য আছিস্? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনো যে চতুষ্পদ হয়ে যাস্‌নি এই ঢের। ঠাকুর বল্‌তেন "মান হুঁস আছে যার সেই মানুষ" তোরা ত 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশীগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস্। তোরা animal (মানবেতর প্রাণীর মধ্যে), তাই struggle (সংগ্রাম) কত্তে বলি। থিওরি মিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহারের স্থির-ভাবে আলোচনা করে ছাখ্ দেখি তোরা animal and human planesএর (মানব এবং মানবেতর ভূমির)

মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ কি না। Physiqueটাকে (দেহটাকে) আগে গড়ে তোল। তবে ত মনের উপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", বুঝ্লি?

শিষ্য। মহাশয়, "বলহীনেন" অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু "ব্রহ্মচর্য্যহীনেন" বলেছেন!

স্বামীজি। তা বলুন্ গে। আমি বল্‌ছি "The physically weak are unfit for the realisation of the Self" (দুর্ব্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না)।

শিষ্য।—কিন্তু সবল শরীর, অনেক জড়বুদ্ধিরও ত দেখা যায়।

স্বামীজি। তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস্ তা হলে তারা যত শীগ্‌গির তা work out (কার্য্যে পরিণত) কত্তে পার্‌বে, হীনবীর্য্য লোক তত শীগ্‌গীর পার্‌বে না। দেখ্‌ছিস্ না, ক্ষীণশরীরে কাম ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুঁট্‌কো লোকগুলো শীগ্‌গীর রেগে যায়—শীগ্‌গীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজি। তা নাই কে বল্‌ছে? মনের উপর একবার control (আধিপত্য লাভ) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক্ বা শুকিয়েই যাক্ তাতে আর কিছু আসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে সে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না। ঠাকুর বল্‌তেন, "শরীরে এতটুকু খুঁত থাক্‌লে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজি উত্তেজিত হইয়াছেন দেখিয়া শিষ্য সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্বামীজির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন— আর এক কথা শুনেছেন্, আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেয়েছিল, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি ?

শিষ্য। তা আপনিই ত আদেশ করেছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব কর্‌তে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম। আপনি পান করিয়া দিলেন কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজি। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে। এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মান্‌বে না।

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি। কথা শুনিয়া স্বামীজি ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় ১২৷৷০ হইয়া যাইল। শিষ্য ঐ রাত্রে বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও জাগাইতে না পারিয়া তাহাকে অগত্যা বাসার রোয়াকে শুইয়া সে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

কালচক্রের কঠোর পরিবর্ত্তনে স্বামীজি, স্বামী যোগানন্দ ও

ভগ্নী নিবেদিতা আজ আর নরশরীরে নাই! তাঁহাদের জীবনের পবিত্র স্মৃতিমাত্রই কেবল পড়িয়া রহিয়াছে!—এবং তাঁহাদের কথা-বার্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়া শিষ্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে।

দ্বাবিংশ বল্লী।

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী।

বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয় —শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠকে স্বামীজির অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার বাসনা—মঠে ব্রহ্মচারীদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প ছিল—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, অন্নসত্র ও সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে যোগ্য করিবার অভিপ্রায়—উহাতে সাধারণের কি কল্যাণ হইত—পরার্থকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না—মায়ার আবরণ সরিয়া গেলেই সকল জীবের ব্রহ্মবিকাশ হয়—ঐরূপ ব্রহ্মবিকাশে সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ হয়—মঠকে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়-ক্ষেত্রে পরিণত করা—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সংসারে সকল প্রকার অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, ইহা দেখাইতেই স্বামীজির আগমন—এক শ্রেণীর বেদান্তবাদীর মত, সংসারের সকলে যতক্ষণ না মুক্ত হইবে, ততক্ষণ তোমার মুক্তি অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞান লাভে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র-জগৎ, সকল জীবকে নিজসত্তা বলিয়া অনুভব হয়—অজ্ঞান অবলম্বনেই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার চলিয়াছে—অজ্ঞানের আদি ও অন্ত—শাস্ত্রোক্তি, অজ্ঞান প্রবাহরূপে নিত্য-প্রায় কিন্তু সান্ত—নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, তদ্বিষয়ের অধ্যাস হয় কি না—ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ মূকাস্বাদনবৎ।

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বর বাবুর বাগান বাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখন জঙ্গলপূর্ণ।

জমিটীর উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ী ছিল; উহারই সংস্করণে বর্ত্তমান মঠবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটী যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজির সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজি শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্য্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতালা ঘরের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজি বলিলেন, "এইখানে সাধুদের থাক্‌বার স্থান হবে। সাধন ভজন জ্ঞান চর্চ্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দিবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে এই থান থেকে ideals (মানবহিতকর উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্ম্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে!"

"মঠের ঐ যে দক্ষিণ ভাগের জমি দেখ্‌ছিস্‌, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরণে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ কর্‌বে। তাদের অশন বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এই সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর trainingএর (শিক্ষালাভের) পরে ইচ্ছা হলে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে

পারবে। মঠের মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছা হলে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, তাদের মঠস্বামিগণ তখনি বহিষ্কৃত করে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে। এতে যাদের objection (আপত্তি) থাক্‌বে, তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চল্‌তে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। তারা অধ্যয়ন মাত্র সকলের সহিত একত্র কর্‌বে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ্‌বেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হলে কেহ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পার্‌বে না। ক্রমে এইরূপে যখন এই মঠের কার্য্য আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল্‌ দেখি ?”

শিষ্য। আপনি তবে প্রাচীনকালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান ?

স্বামীজি। নয় ত কি ? Modern system of educationএ (বর্ত্তমানে দেশে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে) ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নাই। পূর্ব্বের মত ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। তবে, এখন broad basisএর (উদারভাব সমূহের) উপর তার foundation (ভিত্তি স্থাপন) কত্তে হবে, অর্থাৎ, কালোপযোগী অনেক পরিবর্ত্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে বল্‌বো।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—“মঠের দক্ষিণে ঐ যে

জমিটা আছে, ঐটেও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের অন্নসত্র হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা কর্‌বার বন্দোবস্ত থাক্‌বে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুট্‌বে, সেই অনুসারে অন্নসত্র প্রথমে খুল্‌তে হবে। চাই কি প্রথমে দুতিনটী লোক নিয়ে start (কার্য্যারম্ভ) কত্তে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারিগণকে এই অন্নসত্র চালাতে train কর্‌তে (শিখাইতে) হবে। তাদের যোগাড় সোগাড় করে—চাই কি ভিক্ষা করে—এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ বিষয়ে কোনরূপ অর্থসাহায্য কত্তে পার্‌বে না। ব্রহ্মচারিগণকেই উহার জন্য অর্থসংগ্রহ করে আন্‌তে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা বিদ্যা-মন্দির শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ কত্তে পার্‌বে। অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর একুনে দশ বৎসর trainingএর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কত্তে পার্‌বে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা হয় ও মঠের অধ্যক্ষ-গণের তাহাকে উপযুক্ত অধিকারী বুঝে সন্ন্যাসী করা অভিমত হয়, তবে, মঠাধ্যক্ষ কোন কোন বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়ম ব্যতিক্রম করে তাহাকে যখন ইচ্ছা সন্ন্যাস দীক্ষা দিতেও পার্‌বেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বল্‌লুম সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কত্তে হবে। আমার মাথায় এই সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য। মহাশয়, মঠে এইরূপ তিনটী শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজি। বুঝ্‌লিনি? প্রথমে অন্নদান; তার পর বিদ্যাদান। সর্ব্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে কর্‌তে হবে। অন্নদান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থ কর্ম্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবার ভাব দৃঢ় হবে। উহা হতে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হয়ে তাতে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ কর্‌বে।

শিষ্য। মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানশাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি?

স্বামীজি। তুই এতক্ষণেও ঐ কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লি নি! শোন্—এই অন্নের হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে, সেবাকল্পে দীনদুঃখীকে ভিক্ষা শিক্ষা করে, যেরূপে হোক্—দুমুটো অন্ন দিতে পারিস্, তা হলে জীব জগৎ ও তোর মঙ্গল ত হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই, এই সৎকার্য্যের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সৎকার্য্যের জন্য তোকে বিশ্বাস কোরে কামকাঞ্চনে বদ্ধ সংসারী জীব তোর সাহায্য কত্তে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ কত্তে পার্‌বি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কার্য্যে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি, তত আর কোন কার্য্যেই পাবি নি। যথার্থ সৎকার্য্যে

মানুষ কেন, ভগবান্‌ও সহায় হন্। এইরূপে লোক্ আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত কত্তে পার্‌বি। তাই অগ্রে অন্নদান।

শিষ্য। মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম স্থান চাই; তার পর ঐজন্য ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করা চাই! তার পর কায চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

স্বামীজি। মঠের দক্ষিণ দিক্‌টা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্চি ও ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্চি। তুই একটী কি দুটী অন্ধ আতুর সন্ধান কোরে নিয়ে এসে কাল্ থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা করে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন কর্‌লেই দেখ্‌বি—তোর্ এই কার্য্যে কত লোক সাহায্য কত্তে অগ্রসর হবে, কত টাকা কড়ি দেবে। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"।

শিষ্য। হাঁ তাহা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে কালে কর্ম্মবন্ধন ত ঘটিতে পারে।

স্বামীজি। কর্ম্মের ফলে তোর যদি দৃষ্টি না থাকে ও সকল প্রকার কামনা বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হলে ঐ সব সৎকার্য্য তোর কর্ম্মবন্ধন মোচনেই সহায়তা কর্‌বে। ঐরূপ কর্ম্মে বন্ধন আস্‌বে, ওকথা তুই কি বল্‌ছিস্? এইরূপ পরার্থ কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

শিষ্য। আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজি। গরীব দুঃখীদের জন্য well-ventilated (আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈয়ারি কর্‌তে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুই জন কি তিনজন মাত্র থাক্‌বে। তাদের উত্তম বিছানা, পরিষ্কার কাপড় চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাক্‌বে। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধা মত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটী অন্নসত্রের ভিতর একটা wardএর (বিভাগের) মত থাক্‌বে, তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন funds (টাকা) এসে পড়্‌বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) কর্‌তে হবে। অন্নসত্রে কেবল "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্" এই রব উঠ্‌বে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখ্‌লে, তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য। আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টী বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি গঙ্গাপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেন—"তোদের ভিতরে কবে কার সিংহ জেগে উঠ্‌বে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন ত দুনিয়াময়

অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস্, জ্ঞান শক্তি ভক্তি সকলই সর্ব্বজীবে পূর্ণ ভাবে আছে। উহাদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি ও ইহাকে বড় উহাকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভিতর একটা পর্‌দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল। যা চাইবি, যা ইচ্ছে কর্‌বি, তাই হবে।”

স্বামীজির কথা শুনিয়া শিষ্য ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের ভিতরের ঐ পর্‌দাটা কবে সরিয়া যাইয়া তাহার ঈশ্বর দর্শন হইবে!

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—“ঈশ্বর করেন ত এই মঠকে মহা সমন্বয়ক্ষেত্র করে তুল্‌তে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্ব্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয় মূর্ত্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটী এখানে জাগিয়ে রাখ্‌লে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বেন। সর্ব্বমত, সর্ব্বপথ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকল জাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখ্‌তে পায়, তা কর্‌তে হবে। সে দিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন কর্‌লুম, তখন মনে হলো—যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেল্‌ছে। আমি ত যথাসাধ্য কর্‌ছি ও কর্‌ব, তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে; কেবল বেদান্ত পড়ে কি হবে? practical lifeএ (দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনে) শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত কর্‌তে হবে। শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারের ও সমাজের সর্ব্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে

মাঠে ঘাটে পর্ব্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভি তুল্‌তে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।"

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যান সহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজি। সেটা ত নেশা করে অচেতন হয়ে থাকার মত; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাণ্ডব নৃত্য কর্‌বি, কখনো বা বুঁদ হয়ে থাক্‌বি। ভাল জিনিস পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ করে না হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এলো গেলো কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তখনই নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে!—"নিরবধি গগনাভং"—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীব-জগতের সর্ব্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক্ হয়ে পড়্‌বি! স্থাবর জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাকৃতে পার্‌বিনি। এইরূপ অবস্থাই হচ্ছে practical Vedanta (কর্ম্মের ভিতর বেদান্তের অনুভূতি) বুঝ্‌লি?: তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিক ভাবে বহুরূপে সাম্‌নে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখ্‌তে পাস্? এক মাত্র মাটি,

যা এর প্রকৃত সত্তা। সেইরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ সব ভাব্‌ছিস্‌ ও দেখ্‌ছিস্‌। জ্ঞানপ্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব কোন সত্তা নাই, তাই নিয়ে ব্যবহার চল্‌ছে। মাগ ছেলে দেহ মন যা কিছু সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তা অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য। এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজি। কোথেকে এল তা পরে বল্‌বো। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়ুতে লাগ্‌লি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল? না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য। অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজি। তা হলে ভেবে দ্যাখ্‌—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া বলে জান্‌তে পার্‌বি, তখন নিজের পূর্ব্বেকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না? তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না?

শিষ্য। তা হবে।

জি। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়ালো। এইরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ালো। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব্ব-

বিভাসক আত্মার সত্তা বুঝ্‌তে পারছিস নে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাই কেবল অনুভব কর্‌বি, তখনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে— তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ" হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজি। যে জিনিসটা পরে থাকে না—সে জিনিসটা যে মিথ্যা, তা ত বুঝ্‌তে পেরেছিস? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে, সে বল্‌বে, অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে। সাপ বলে দেখ্‌তে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয় ভীতি দেখে তার হাসি পায়। সে জন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নাই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না। "সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো"। যে জিনিসটা এইরূপে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হতে পারে না। কেন তা শোন্। এই প্রশ্নোত্তরটাও ত সেই নামরূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে। যে ব্রহ্মবস্তু নামরূপ দেশ কালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বুঝানো যায়? এই জন্য শাস্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারিক ভাবে সত্য—পারমার্থিক রূপে সত্য নয়। অজ্ঞানের স্বরূপই নাই, তা আবার কি বুঝ্‌বি? যখন ব্রহ্মের

প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন কর্‌বার অবসরই থাক্‌বে না। ঠাকুরের সেই "মুচী মুটের" গল্প শুনেছিস্ না? ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজি। যে জিনিসটাই নাই, তা আবার আস্‌বে কি করে? থাক্‌লে ত আস্‌বে।

শিষ্য। তবে এই জীব জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজি। এক ব্রহ্মসত্তাই ত রয়েছেন। তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখ্‌ছিস্।

শিষ্য। এই মিথ্যা নাম রূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজি। শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহ-রূপে নিত্যপ্রায় বলেছে। কিন্তু উহা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্ব্বদা দড়ার মত স্ব স্ব রূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত—ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। একটা কথা এখনো বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজি। কি বল্‌না?

শিষ্য। এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাদের কোন স্বরূপ সত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই, সেই জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনো সাপ দেখে

নাই, তার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না, সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টি ভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে। ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান কর্‌বে যে, তার দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। সে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখ্‌ছে। রজ্জুই দেখ্‌ছে, সাপ দেখ্‌ছে না। তুই যদি বলিস্, 'আমি ত এই সৃষ্টি বা সাপ দেখ্‌ছি'—তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর কত্তে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কর্‌বেন। যখন তাঁর উপদেশ ও বিচার বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা, বুঝ্‌তে পার্‌বি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান বা সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বল্‌তে পারিস্? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টি ভাগাদি চলে এসে থাকে ত থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব করামলকবৎ প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না এবং তখন আর প্রশ্নও উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন "মূকাস্বাদনবৎ" হয়।

শিষ্য। তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজি। ঐ বিষয়টা বুঝ্‌বার জন্যই বিচার। সত্য বস্তু কিন্তু বিচারের পারে—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"।

ঐরূপ কথা হইতে হইতে শিষ্য স্বামীজির সঙ্গে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজি মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

কলিকাতা
১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
বাগবাজার
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী কপিল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
৯১।২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
"নববিভাকর প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত